Alaap :Puja Parbo 2025

BENGALI ASSOCIATION OF ATLANTIC CANADA
BAAC
ESTD. 2024
NOVA SCOTIA

Durga Puja in Atlantic Canada- Honouring Mi’kmaw Land and Spirit

Message from Bengali Association of Atlantic Canada – BAAC

Bengali Association of Atlantic Canada, a non-profit organization, was established in November 2024. The society was founded with the vision to celebrate the growing vibrant Bengali Community in Atlantic Canada. BAAC's endeavor is to create a space that fosters community bonding, religious faith and strengthens our rich culture.

In the last year, we have successfully organized 4 events starting with Saraswati Pujo in February, Aarohi – A Baisakhi Mahotsav in April, Bonbhojon – BAAC Annual Picnic in July and Dashbhuja Durgotsav in October. Each of these events were large scale and we received overwhelming response from the community.

Dashabhuja Durgotsav was the mega event of the year which was celebrated over a stretch of 3 days and was attended by over 240 community members from Halifax and other Atlantic regions as well. At the event, BAAC brought in the essence of Bengal showcasing Bengali Food, Music, Dance, Handicrafts etc. The highlights of the event was the Purohit team which was led by Mahila Purohit along with their very esteemed counterparts. This year at the Dashabhuja Durgotsab the attendees witnessed an improvised version of the ancient ritual of

" Hori Loot" through Chocolate Loot which was received with immense enthusiasm by the young and the old. This year we also brought in the traditional ritual of Kumar Kumari Pujo where the elderly blessed all the boys and girls with Dhan Dubbo and handed over small goody bags. The Maha Ashtami Aarti was also performed with a new grandeur where all the members of the Purohit team performed the Maha Aarti along with the main Purohit. The entire atmosphere was thriving with devotion and joy. The sight was one to behold and cherish until we come back with the festivities next year

As we conclude the first year of BAAC, we want to express our most humble gratitude to the entire community, all the crew members and the organizing committee who have worked relentlessly with a smile on their faces to make each event successful. We also want to thank our event and pujo sponsors, vendors form their unconditional support. We could not have done it without you.

BAAC wishes everyone the very best and we will be meeting soon for Christmas and New Year Eve.

Best Wishes,

BAAC Core Team:
Bithika Ray, Ishita Chowdhary, Sandhita Saha, Shrabanti Das, Soumita Bosu Roy Chowdhuri, Devi Chakraborty, Giban Ray, Amit Chowdhary, Aroop Chatterjee, Tathagata Ray, Binoy Halder, Kallol Bosu Roy Chowdhuri, Pallab Chakraborty, Diptangshu Datta

Message from the Alaap – Puja Parbo e-Magazine Committee
Bengali Association of Atlantic Canada (BAAC)

As the rhythm of Durga Puja fills our hearts with joy and togetherness, Alaap – Puja Parbo once again stands as a reflection of our vibrant community spirit. Each page of this issue is an embroidery woven with your love, creativity, and dedication. As the sound of the Dhak and the echo of the Kashi slowly fade into cherished memories, the words and emotions captured within these pages will continue to resonate keeping our hearts connected and our spirits vibrant until the next Puja arrives. Through these writings, we carry forward the rhythm of celebration, reminding ourselves that the spirit of Durga Puja lives on not just in the days of festivity, but in every story, poem, and shared moment that binds us together as a community and the connectivity with friends and families.

We, the e-Magazine Committee, would like to extend our heartfelt gratitude and love to all contributors, participants, sponsors, vendors, and well-wishers who have supported us with such enthusiasm and generosity. Your stories, poems, artwork, and messages breathe life into Alaap, transforming it from a publication into a shared celebration of our culture and values. Without your support, the colours and vibrancy of this grand event would surely fade. It is your participation and encouragement that make Alaap- Puja Parbo truly comes alive. We sincerely apologize for the delay in publishing this edition of the magazine. Your patience and continued

enthusiasm mean the world to us. As we look ahead, we eagerly seek your support, creativity, and love in our future publications, so that Alaap continues to grow richer with every edition. It is truly heartening to see so many young members of our next generation expressing their thoughts, creativity, and emotions through their beautiful writings and artworks for this magazine. Their participation inspires us with hope and pride, assuring that our cultural spirit will continue to thrive through them in the years to come.

Our sincere thanks also go to each member of the e-magazine team who worked tirelessly behind the scenes in organizing, writing, editing, designing, and capturing precious moments. Their dedication goes far beyond the making of this magazine; they are the driving force behind every aspect of our Durga Pooja celebration- from planning and logistics to decoration, cultural programs, food arrangements, and hospitality. Together we continue to nurture a community that celebrates both tradition and togetherness, even while miles away from our homeland.

May the blessings of Maa Durga bring strength, harmony, and happiness to every home. We hope you enjoy reading this edition of Alaap – Puja Parbo as much as we enjoyed creating it.

With warm regards,

The e-Magazine Committee- Alaap – Puja Parbo
Bengali Association of Atlantic Canada
Giban Ray, Ishita Chowdhary, Shrabanti Das, Kaustav Banerjee, Atanu Das Gupta, Goldy Das, Soumita Bosu Roy Chowdhuri

সূচী পাতা

- বিবিধের মাঝে - প্রবাসী ভারতীয় এবং দেশীয় জনগোষ্ঠীর সাদৃশ *(কৌস্তভ ব্যানার্জী)---------------- Page 9*
- ধন *(জীবন রায়)------------------------- Page 14*
- গোগলের ওভারকোট: আমাদের শিকড়, আমাদের নির্বাসন *(কৌস্তভ ব্যানার্জী)------------------------ Page 15*
- কুমারী পূজা *(জীবন রায়)-----------------Page 17*
- মনসিজ *(দেবলীনা)--------------------- Page 18*
- আমার মেয়েবেলার গল্প *(দেবযানী ভট্টাচার্য)---- Page 19*
- পাখিসব করে রব রাতি পোহাইল
  কাননে কুসুমকলি সকলই ফুটিল *(দীপিকা সামন্ত)-----Page 24*
- মুখোশ *(সোমদত্তা চ্যাটার্জী)------------------- Page 25*
- ক্ষণকাল *(মহুয়া সেনগুপ্ত)------------------- Page 26*
- पानी पानी रे, खारे पानी रे,
  नयनों में भर जा,... *(দেবতনু ভট্টাচার্য।)--------------Page 27*
- দূর *(মহুয়া সেনগুপ্ত)------------- Page 34*

- অমৃতস্য পুত্রী (অমৃতা মুখার্জী)-------- Page 35
- সাধনা, ওরা (মদন সামন্ত)------------- Page 40
- আগমনী (ঈশিতা রায়)------------------- Page 41
- শারদ শৈশব (ঈশিতা রায়)-------------- Page 42
- স্বপ্ন (জয়শ্রী বসু)---------------------- Page 44
- ফেলে আসা পথ (Poem - Phele Asha Poth by Subhas Chandra Ghosh. Illustration - Somaditya Das)------------------- Page 45
- পূজোর গন্ধ (শায়নী রাউত) ------------ Page 47
- পটকা ও ফটকা (শঙ্কর লাল সাহা) ---------Page 50
- মুঠোফোন (তনুকা ভৌমিক)--------------------- Page 51
- ঘাটশিলা ভ্রমণ যেন এক তীর্থ দর্শন ---------- Page 52 (ড: সুব্রত মণ্ডল)
- নারী দিবস (বিশ্বদেশ চক্রবর্তী) ----------- Page 55
- নিবারণের ভূত (অমল ভট্টাচার্য্য)---------- Page 56
- অন্তিম পথে (শঙ্কর লাল সাহা) -------------- Page 64
- বাংলাদেশ ও ভারতে দুর্গাপূজা: ঐতিহাসিক শেকড় থেকে আধুনিকতার মহামিলন (শুভ্র পাল)----- Page 65

- তোমায় খুঁজে ফিরি (ধারা ভৌমিক ভাদুড়ী)-------- Page 74
- স্ট্যাটাস (ড: চন্দ্রশেখর চক্রবর্তী) --------------- Page 75
- শারদীয়া আগমনী(স্বাতী আচার্য) ------------- Page 78
- মা আসছেন (গুড়াকেশ রায়চৌধুরী) ------------ Page 79
- কথা (অনুপা ভৌমিক)------------------------ Page 80
- তোমাকে খুঁজতে গিয়ে (দেবাশিস হালদার)----- Page 81
- পলাশের নেশা দিয়ে (পূর্ণিমা বসু) ----------- Page 82
- Anxiety (Sushmita Chatterjee)------- Page 83
- She is Durga, She is Shakti(Poulomi Bandyopadhyay) ------------------------- Page 85
- Where Devotion Meets Community: BAAC's First Durga Pujo (Shrabanti Das) ----------- Page 86
- Many Ramayanas (Atanu Das Gupta) ------- Page 88
- Drawings -------------- Page 90-101
- Some Glimpses of BAAC's Different Team---Page 102

বিবিধের মাঝে - প্রবাসী ভারতীয় এবং দেশীয় জনগোষ্ঠীর সাদৃশ্য

যখন ভারতীয়রা প্রথমে উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় কানাডায় অভিবাসন শুরু করেছিলেন - ছাত্র, পেশাজীবী, পরিবারসহ - তারা কেবল শারীরিকভাবে স্থানান্তরিত হননি, বরং সঙ্গে করে এনেছিলেন নিজ দেশের হাজার বছরের সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং মানসিক অভিজ্ঞতা। গ্রামের ভোরের নীরবতা, শহরের গলি-ঘাটির ভিড়, উৎসবের আনন্দ—সবই একটি অদৃশ্য ছোপের মতো তাদের সঙ্গে নতুন দেশে প্রবেশ করেছিল। মসলার তীব্র গন্ধ, রেসিপির নিখুঁত সঙ্গতি, বিভিন্ন উৎসবের রঙিন সাজ - এগুলো শুধুই খাবার বা উত্সব নয়; এগুলো হল এক ধরনের সাংস্কৃতিক স্মৃতি যা সময়ের সঙ্গে তাদের মানসিক পরিচয়কে ধরে রাখে। ভাষা, ধর্মীয় আচরণ, সামাজিক বন্ধন—সবই তাদের মধ্যে একটি অভ্যন্তরীণ “মৃত্যু-পূর্ব স্বভাব” রচনা করেছিল, যা দূরত্বের মধ্যেও তাদেরকে মূল পরিচয় মনে করিয়ে দিত।

কিন্তু কানাডার বাস্তবতা একেবারেই ভিন্ন ছিল। এখানে শীত প্রায়শই তীব্র এবং দীর্ঘ, অনেক সময় −৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত পৌঁছে যায়, যা ভারতীয়দের জন্য এক নতুন এবং চ্যালেঞ্জিং অভিজ্ঞতা। বিশাল উন্মুক্ত পর্বত, বনাঞ্চল এবং বরফে ঢাকা জলাভূমি -এই পরিবেশগুলি তাদের মনকে প্রাথমিকভাবে বিচ্ছিন্ন ও অচেনা মনে করায়। আরও গুরুত্বপূর্ণ হল, কানাডার বহুপর্যায়ে ঔপনিবেশিক ইতিহাস, যা দেশটির ভূগোল এবং সমাজের প্রতিটি অংশে প্রতিফলিত। অনেক ভারতীয় প্রথমে বুঝতেই পারতেন না যে তারা একটি দেশে বসবাস করছেন যেখানে দেশীয় জনগোষ্ঠী দীর্ঘ সময় ধরে নিজস্ব ভূমি, সংস্থান এবং সংস্কৃতি রক্ষা করতে লড়াই করে আসছেন। এই অচেনা সামাজিক এবং রাজনৈতিক বাস্তবতা নতুন অভিবাসীদের জন্য প্রাথমিকভাবে এক ধরনের “ভূমি-বিদেশী” অনুভূতি তৈরি করে।

তবুও, এই দূরত্ব এবং ভিন্নতার মধ্যেও সূক্ষ্ম মিল দেখা যায়। কানাডায় বসবাসকারী এনআরআই ভারতীয়রা, তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি রক্ষা এবং সম্প্রদায় গঠনের প্রয়াসে, অনেক ক্ষেত্রে দেশীয় জনগোষ্ঠীর জীবনযাপনের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

যেমন, মিকম্যাক এবং ইনুইটরা তাদের পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে সম্প্রদায়ভিত্তিক জীবনধারা গ্রহণ করেছে - সংসাধনের ভাগাভাগি, একে অপরের উপর নির্ভরশীলতা, প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে জ্ঞান স্থানান্তর। এনআরআই ভারতীয়রাও নতুন দেশে সেই একই সম্প্রদায়ভিত্তিক আভ্যাস তৈরি করেছেন - গুরদ্বারায় একত্র হওয়া, স্থানীয় উৎসব উদযাপন করা, পরস্পরের মধ্যে সাহায্য এবং জ্ঞান ভাগাভাগি করা। ফলে, যদিও ইতিহাস, পরিবেশ এবং প্রেক্ষাপট ভিন্ন, মানসিক ও সামাজিক অভিজ্ঞতায় উভয়ই এক ধরনের মিল খুঁজে পায়।

সম্প্রদায়: জীবনরক্ষা ও সমর্থন

এনআরআই ভারতীয় এবং দেশীয় জনগোষ্ঠীর জন্যই সম্প্রদায় কোনো বিকল্প নয়; এটি তাদের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং বেঁচে থাকার একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। মিকম্যাক পরিবার ঐতিহ্যগতভাবে ঘনিষ্ঠ সম্প্রদায়ে বাস করতো। শিকারের কাজ, মাছ ধরা, বনজাত সম্পদ সংগ্রহ - সবই ব্যক্তিগত চেষ্টা নয়, বরং পুরো সম্প্রদায়ের সহযোগিতায় সম্পন্ন হতো। সম্পদ ভাগাভাগি করা, শিশুকে শেখানো, অভ্যন্তরীণ নিয়ম-কানুন মেনে চলা - সবই বেঁচে থাকার প্রক্রিয়ার অংশ ছিল। শিশুদের শিক্ষার মূল মাধ্যম ছিল গল্প, নাচ, গান এবং অভিজ্ঞতামূলক শিখন। প্রতিটি সদস্যের ভূমিকা স্পষ্ট এবং অপরিহার্য, কারণ একটি সঙ্গতিহীন পদক্ষেপ পুরো সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রা প্রভাবিত করতে পারত।

অনুরূপভাবে, কানাডায় বসবাসকারী ভারতীয়রা তাদের নতুন পরিবেশে বেঁচে থাকার জন্য সম্প্রদায়ের উপর নির্ভরশীল। তারা নতুন দেশে পরিপূর্ণভাবে একা নয়; বরং পরিবারের বন্ধন, বন্ধু-বান্ধব এবং প্রবাসী নেটওয়ার্কের মাধ্যমে সামাজিক সমর্থন তৈরি করে। সারে-এর গুরদ্বারায়, টরোন্টোর মন্দিরে বা অন্যান্য প্রাদেশিক শহরে এই সম্প্রদায় শুধু ধর্মীয় আয়োজনের জন্য নয়, বরং আবাস, কর্মসংস্থান, মানসিক সমর্থন এবং সাংস্কৃতিক ধারাবাহিকতার জন্যও কার্যকর। হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ বা ফেসবুক কমিউনিটি ভারতীয় অভিবাসীদের মধ্যে কার্যকর সমন্বয় তৈরি করে - কোনো নতুন চাকরির সুযোগ, বাসস্থান, স্কুল ভর্তি বা সাময়িক সাহায্য প্রয়োজন হলে তা দ্রুত পৌঁছে যায়।

এভাবে, এনআরআই সম্প্রদায় পুনর্গঠন করে কেবল আরাম বা আনন্দের জন্য নয়; এটি বেঁচে থাকার একটি কৌশল। নতুন দেশে সামাজিক নিরাপত্তার একটি ভার্চুয়াল এবং বাস্তব কাঠামো তৈরি করা, নিজেদের পরিচয় রক্ষা করা এবং প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে সাংস্কৃতিক জ্ঞান স্থানান্তর করা - সবই এই সম্প্রদায়ের

মাধ্যমে সম্ভব। মূলত, উভয় ক্ষেত্রে - মিকম্যাক বা এনআরআই ভারতীয় - সম্প্রদায় হল এক প্রকার “জীবনরক্ষা নেটওয়ার্ক,” যা ব্যক্তিকে পৃথকভাবে নয়, সম্মিলিতভাবে শক্তিশালী করে।

কঠোর আবহাওয়ার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়া

ইনুইট জনগোষ্ঠী বহু শতাব্দী ধরে পৃথিবীর অন্যতম কঠোর আবহাওয়ায় টিকে থাকার কৌশল শিখেছে। বরফে মোড়া ভূমি, দীর্ঘ শীতকালীন অন্ধকার, আর সীমিত প্রাকৃতিক সম্পদ -এসবই তাদের জীবনধারাকে গড়ে তুলেছে। তারা গড়ে তুলেছে ইগলু, যা শুধুই একটি অস্থায়ী আশ্রয় নয় বরং স্থাপত্যের এক অনন্য উদাহরণ। পশুর চামড়া দিয়ে তৈরি পোশাক তাদের শরীরকে উষ্ণ রাখত, একই সঙ্গে বাতাস চলাচলের সুযোগও দিত। বরফ ও তুষারে ভরা ভূদৃশ্যে তারা দিকনির্দেশ শিখত, শিকার করার সময় প্রাণীর গতিপথ বোঝার ক্ষমতা গড়ে তুলেছিল।

অন্যদিকে, এনআরআই ভারতীয়দের জন্য কানাডার শীত একটি সম্পূর্ণ নতুন অভিজ্ঞতা। ভারতীয় উপমহাদেশের উষ্ণ বা নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়া থেকে এসে তারা প্রায়শই প্রথমবারের মতো তীব্র শীতের মুখোমুখি হয়। এখানে বেঁচে থাকার কৌশল ভিন্ন হলেও মূল ভাব এক -খাপ খাওয়ানো। নতুন অভিবাসীরা শিখে নেন ভারী জ্যাকেট, থার্মাল পোশাক, এবং তুষার পরিষ্কার করার কৌশল। তাদের দৈনন্দিন জীবনের অংশ হয়ে যায় হিটার চালু করা, গাড়িতে স্নো-টাইয়ার লাগানো, অথবা নাক-মুখ ঢেকে বাইরে বের হওয়া। যদিও তারা শতাব্দীব্যাপী অভিজ্ঞতার উত্তরাধিকার বহন করেন না যেমন ইনুইটরা করে, তবুও তারা দ্রুত খাপ খাওয়ানোর মানসিকতা প্রদর্শন করে। মূলত, উভয় ক্ষেত্রেই পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য গড়ে তোলা এক ধরনের বেঁচে থাকার শিল্প।

খাবার: সাংস্কৃতিক সংরক্ষণ

খাবার মানুষের সাংস্কৃতিক পরিচয়ের গভীরতম বহিঃপ্রকাশ। ইনুইটদের ক্ষেত্রে সীল, কারিবু বা চার মাছ শুধুমাত্র খাদ্য নয় - এগুলো তাদের আচার, শিকার কৌশল এবং ভূমির সঙ্গে সম্পর্কিত। এই খাবার খাওয়া মানেই প্রকৃতির সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করা, পূর্বপুরুষদের জীবনধারা অনুসরণ করা। খাবার সেখানে বেঁচে থাকার সাথে সাথে আধ্যাত্মিক একতার প্রতীক।

একইভাবে, এনআরআই ভারতীয়দের জন্য খাবার কেবল পেট ভরানোর বিষয় নয়। এটি তাদের পরিচয়, শিকড়, এবং আবেগের প্রতীক। ভারতীয় অভিবাসীরা কত দূরে থাকুক না কেন, ডাল, চাল, মসলা, আচার - এসব ছাড়া তাদের রান্নাঘর কল্পনা করা যায় না। ভারতীয় দোকানগুলোতে ভিড় জমে যায় শুধুমাত্র উপাদান সংগ্রহের জন্য নয়, বরং শিকড়কে ধরে রাখার জন্য। রান্না হয়ে ওঠে সাংস্কৃতিক স্মৃতির পুনর্গঠন - মায়ের রেসিপি মনে করে ডাল রান্না করা, বা উৎসবে লুচি-আলুর দম বানানো। উভয় ক্ষেত্রেই খাবার বেঁচে থাকার পাশাপাশি একটি সাংস্কৃতিক ধারাবাহিকতার প্রতীক, যা মানুষকে নিজেদের অতীতের সঙ্গে যুক্ত রাখে।

ঔপনিবেশিক ইতিহাসের সঙ্গে স্থান নিয়ন্ত্রণ

এখানেই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য এবং মিল দেখা যায়। ইনুইট ও মিকম্যাক জনগোষ্ঠী ঔপনিবেশিক শক্তির দ্বারা স্থানচ্যুত, বঞ্চিত এবং সাংস্কৃতিক দমন-নীতির শিকার হয়েছে। তারা তাদের পূর্বপুরুষের ভূমি থেকে আলাদা হতে বাধ্য হয়েছে, ঐতিহ্যগত জীবনধারা ও ভাষা হারানোর সংকটে পড়েছে। এখনো তারা আত্মপরিচয় ও অধিকার রক্ষার সংগ্রামে লিপ্ত।
অন্যদিকে, এনআরআই ভারতীয়রা এসেছে একটি ভিন্ন ইতিহাস নিয়ে। তারা অভিবাসন নীতির সুবিধাভোগী, অর্থনৈতিক সুযোগ বা উচ্চশিক্ষার আকাঙ্ক্ষায় কানাডায় প্রবেশ করেছে। তবুও, তাদের জন্যও স্থান-নিয়ন্ত্রণের প্রশ্ন গুরুত্বপূর্ণ। তারা এমন ভূমিতে বসবাস করছে যা প্রকৃতপক্ষে দেশীয় জনগোষ্ঠীর, অথচ অনেক সময়ই তারা এ ইতিহাস সম্পর্কে সচেতন নয়। পাশাপাশি, তারা বর্ণবাদ, সাংস্কৃতিক ভিন্নতা এবং বিদেশী ট্যাগ বহন করে। ফলে, উভয় গোষ্ঠীর মধ্যে একটি অদ্ভুত মিল গড়ে ওঠে - একদল নিজের অধিকার ফিরিয়ে পেতে সংগ্রাম করছে, আরেকদল নতুন ভূমিতে শিকড় গড়ে তুলতে চেষ্টা করছে। উভয়কেই প্রতিদিন স্থান, পরিচয় এবং স্বীকৃতির প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয়।

কথার মাধ্যমে বেঁচে থাকা
মিকম্যাক ও ইনুইট জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতির কেন্দ্রে আছে মৌখিক ঐতিহ্য। গল্প, গান, নৃত্য, লোককথা - এসবের মাধ্যমে তারা প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে জ্ঞান, ইতিহাস, ও অভিজ্ঞতা স্থানান্তর করেছে। এটি কেবল বিনোদন নয়; বরং শিক্ষা, ইতিহাস রক্ষা, এবং সাংস্কৃতিক ধারাবাহিকতা বজায় রাখার প্রধান উপায়।

ভারতীয় অভিবাসীরাও গল্পের মাধ্যমে নিজেদের রক্ষা করে। নতুন প্রজন্মকে বলা হয় দাদু-দিদার গ্রামজীবনের গল্প, উৎসবের রঙিন স্মৃতি, স্বাধীনতা বা বিভাজনের ইতিহাস। প্রবাসে এই গল্পগুলো শিকড়ের স্মৃতি মনে করিয়ে দেয়, এবং নতুন প্রজন্মকে শেখায় যে তাদের পরিচয় কেবল কানাডিয়ান নয়, বরং ভারতীয়ও। ফলে, উভয় গোষ্ঠীই বুঝতে পারে যে গল্প বলা মানে স্মৃতি রক্ষা, পরিচয় ধরে রাখা, এবং দূরত্ব অতিক্রম করা।

সদৃঢ়তা: ইতিহাস ভিন্ন, মনোভাব মিল

সবশেষে আসে দৃঢ়তার প্রশ্ন। ইনুইট এবং মিকম্যাকরা তাদের ভূমি ও সংস্কৃতির জন্য সংগ্রাম করেছে দীর্ঘদিন ধরে। এনআরআই ভারতীয়রা স্বেচ্ছায় স্থানান্তরিত হলেও নতুন দেশে শিকড় গড়ে তুলতে তাদেরও সংগ্রাম করতে হয়েছে। উভয়ের ইতিহাস ভিন্ন, কষ্ট ভিন্ন, কিন্তু দৃঢ়তার অভিজ্ঞতা এক। দুই পক্ষই সম্প্রদায়ের শক্তিতে বাঁচে, খাবারে সংস্কৃতি রক্ষা করে, গল্পে ইতিহাস টিকিয়ে রাখে। এক পক্ষ পূর্বপুরুষের উত্তরাধিকার আঁকড়ে ধরে, অন্য পক্ষ প্রবাসের বাস্তবতায় নতুন স্মৃতি তৈরি করে। কিন্তু উভয়েরই লক্ষ্য একই - পরিচয় অক্ষুণ্ণ রাখা, পরিবর্তনের স্রোতে ভেসে গিয়েও নিজেদের অস্তিত্ব বাঁচিয়ে রাখা।

-কৌস্তভ ব্যানার্জী

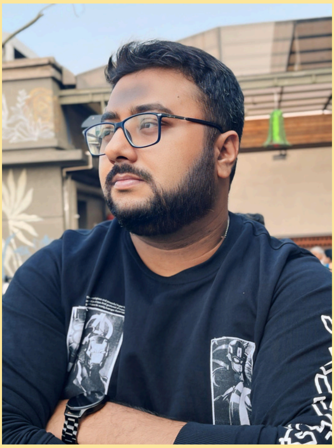

ধন

সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠি
যন্ত্রের ন্যায় ধনের পিছনে ছুটি।
আলুথালু বেশে গুটিগুটি পায়ে,
আবার সাজগোজ করে ডাইনে-বায়ে।

সকাল গড়িয়ে বিকালের সন্ধ্যা নামে,
মন শুধু ধনের ধ্যানেতেই থামে।
যতই পাই, তৃষ্ণা তবু মিটিতে না চাহে ,
লোভ মোহ দেহ প্রাণে অগ্নি সম দাহে।

ভুলে যাই মধুর হাসি, ভুলে যাই গান ,
ভুলে যাই আপনজনের প্রাণের টান।
ফুলের গন্ধ কাছে এসে ফিরে যায়,
ফাগুন হাওয়া দূর থেকে বিদ্রুপ জানায়।

স্বর্ণ পালঙ্কে শুয়ে নিদ্রা নাহি আসে,
মন কেবলই সুখ খোঁজে চারিপাশে,
অলংকারের মাঝে অহংকার বেঁধেছে বাসা
মন থেকে হারিয়ে গেছে প্রেমের ভাষা।

সত্য ধন জানি সে প্রেম, দয়া আর দান,
নিধনের পরেও রহে সে ধন চির অম্লান।
সোনার ভাণ্ডার মুছে যাবে কালের গর্ভে,
মানবতার ধন দীপ্ত রবে জীবনের পর্বে পর্বে।

-জীবন রায়

গোগলের ওভারকোট: আমাদের শিকড়, আমাদের নির্বাসন

নিকোলাই গোগোল যখন উনিশ শতকের মাঝামাঝি *The Overcoat* লিখেছিলেন, তখন হয়তো তিনি কল্পনাও করেননি, যে দস্তয়েভস্কির সেই বিখ্যাত উক্তি - *“We all came out from Gogol’s overcoat”* - শতাব্দী পেরিয়ে, দেশ-দেশান্তর ঘুরে, ব্যক্তিগত জীবনেও এমন অনুরণন তৈরি করবে। আমার কাছে এই লাইনটি যেন এক অপ্রাপ্ত উত্তরাধিকার। ওভারকোট কেবল একটি পোশাক নয়, বরং এক রূপক - যা আমাদের আপনজনের গন্ধে ভিজে আছে, যা পরিচয়ের সেলাইয়ে বাঁধা, আর যা আমরা বহন করি সীমান্ত পেরিয়ে। আর বাড়ি থেকে বহু দূরে দাঁড়িয়েও কখনও কখনও এই ওভারকোটই হয়ে ওঠে আমাদের একমাত্র আশ্রয়, নির্বাসনের হিমশীতল ঠাণ্ডা থেকে বাঁচিয়ে রাখার উষ্ণতায় মাখামাখি হয়ে।

এখন আমি থাকি হ্যালিফ্যাক্সে - কানাডার পূর্ব উপকূলের এক বন্দরনগরে। আটলান্টিক সাগরের ঢেউ প্রতিদিন পাথুরে তীরে আছড়ে পড়ে, কুয়াশা ঢেকে দেয় শহরকে ঠিক স্মৃতির মত, আর সন্ধ্যা নামে এক নিঃশব্দতার আবরণে, যা কলকাতার অস্থির রাতের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। সিটাডেল হিলের পুরোনো ঘড়িঘরের পাশে হাঁটতে হাঁটতে আমি ফিরে দেখি নিজের সময়কে — দীর্ঘ ছাব্বিশ বছরের স্মৃতি । ১৯৯৯ সাল থেকে শুরু হওয়া বাড়িছাড়া জীবন, স্কুল থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয়, আর এখন কর্মজীবনের দীর্ঘ প্রবাস। প্রথমে ভেবেছিলাম সাময়িক, এক ধাপ মাত্র। কিন্তু সাময়িকই এখন হয়ে উঠেছে স্থায়ী; জীবন যেন খন্ড খন্ড হোস্টেল রুম, ভাড়ার ফ্ল্যাট, আর এই পেশাগত নির্বাসনের জোড়াতালি।

তবুও শরৎ আসে, এখানে গাছের পাতা রঙিন হয়ে ঝরে পড়ে, আমার মন ফিরে যায় অন্য এক শরতে - শরৎকাল - যখন কলকাতার আকাশ নীলচে সাদা তুলোর ফালি ফালি মেঘে ভরে ওঠে, যেন ডাকের সাজের প্রস্তুতি। সেটাই দুর্গাপুজোর সময়। আর সেটাই সেই মুহূর্ত, যখন এই স্বেচ্ছার নির্বাসন সবচেয়ে বেশি কষ্ট দেয়।

দুর্গাপূজা কেবল উৎসব নয়; এটা এক ঋতু, এক মেজাজ, এক সম্মিলিত উন্মাদনা। বাঙালির কাছে এটাই পরিচয়ের আসল রঙ। তাদের প্রাণের শহর তখন আলো আর শব্দে ঝলমল করে ওঠে। এক রাতের মধ্যে প্যান্ডেল উঠে যায়, কখনও গির্জার মতো, কখনও নাট্যমঞ্চের মতো। ধুনোর গন্ধ, ঢাকের তালে কাঁপা বুক, শঙ্খধ্বনি, নতুন কাপড়ের খসখস শব্দ - সব মিলিয়ে এক অদ্ভুত ব্যাকরণ তৈরি হয়, যার মধ্যে আমরা খুঁজে পাই প্রাণের ছন্দ, আমাদের অস্তিত্বের ভাষা।

ছোটবেলায় এসবের জন্য কোনো প্রচেষ্টা ছিল না। পুজো মানেই ছিল ছুটির দিন, বন্ধুরা, রাস্তার খাবার, প্যান্ডেল হপিং, আর ভিড়ের ভেতরে হারিয়ে যাওয়ার আনন্দ। কিন্তু ৯৯-এর পর থেকে সেই ছন্দ ভেঙে গেছে। একেক বছর একেকভাবে কেটে গেছে - কখনও হোস্টেলে, কখনও বিদেশে। প্রতি বছর যেন আরও একটু দূরে সরে গেছি। কোনো বছর হয়তো ছুটে গেছি, আবার কোনো বছর ট্রেন মিস করার মতো করে উৎসব চলে গেছে আমার অগোচরে।

হ্যালিফ্যাক্সে পুজো অন্যরকম – প্রবাসের বাঙালির মিলন, কমিউনিটি হলে মায়ের প্রতিমা, সাজসজ্জা, আর স্বেচ্ছাসেবকদের রান্না করা ভোগ। আবেগে ভরপুর, হ্যাঁ, কিন্তু কলকাতার জৌলুসের ছায়ায় বেড়ে ওঠা নবপল্লব মাত্র। এখানে নেই লাখো মানুষের ভিড়, নেই প্যান্ডেল নিয়ে অন্তহীন বিতর্ক, নেই রাতভর আড্ডার শেষে ফুচকার ঠোঙা। এখানে সবই সংক্ষিপ্ত সংস্করণ, একপ্রকার স্মৃতির প্রতীক।

-কৌস্তভ ব্যানার্জী

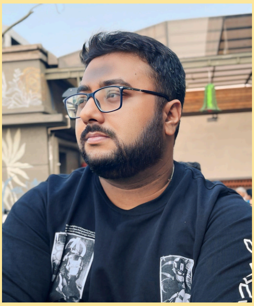

কুমারী পূজা

- জীবন রায়

ফুল সম সব শিশুদের মুখে অমল হাসি,
লুকিয়ে আছে মায়ের অশুভ শক্তি নাশী।
উচ্ছল আনন্দ, পবিত্র হৃদয়, নিষ্কলুষ প্রাণ,
ছোট্ট ছোট্ট অন্তরে শুদ্ধতার দেবত্ব মহান।

ক্ষুদ্র কোমল দেহে অসীম সাহসের শক্তি,
অপার করুণা আর প্রেম ভরা পরম ভক্তি।
নীড়ের মত চোখে রুদ্র দীপ্ত বহ্নিশিখা জ্বলে,
শুম্ভ নিশুম্ভ মধুকৈটভ লুন্ঠিত ভূমিতলে।

কুমারী রূপে দেবী দূর্গা মাতৃস্নেহে তুমি,
সন্তানের তরে স্নেহবর্ষণে ধন্য জগৎভূমি।
দূর করো যন্ত্রনা, দুঃখ, দারিদ্র্য, ভয়,
আশীর্বাদে ধন্য- শান্তি জ্ঞানে ভক্তের হৃদয়।

আজ নারী শক্তি কুমারী পূজার আয়োজন
'অমৃতস্য পুত্রা'- নারী দেবাংশ- জানা প্রয়োজন,
কন্যার মধ্যে দুর্গার অপরাজিতা শক্তি বিদ্যমান
শ্রদ্ধাভরে মনে রাখো- দিয়ে যোগ্য সম্মান।

মনসিজ

-দেবলীনা
হাতিয়া, বীরভূম

মন পাখি উড়ে যায়,
মাস্তুল খুঁজে পায়-
অভিলাষ ক্ষীণকায়!

মলমাস হৃদয়ের।
স্পর্শতা চয়নের,
বন্ধতা কায়েমের।

আবেগের ভিড়ে এই,
দ্বিধাহীন প্রেমেরই
কম্পাস কাছে নেই!

স্তব্ধতা মানতো।
অজুহাত জানতো,
অহেতুক অপেক্ষা বুনতো।

বাঁধব কি বেতারে!
স্বপ্নের সেতারে-
প্রিয় রাগ বাহারে'?

মৌতাতে গুনগুন !
বারুদের ফাগুন-
হৃদ্-বিদারী আগুন।

চোখের সীমারেখা'
অশ্রু বারি মাখা-
প্লবতা, যে যায় না রোখা।

বারেক যদি চাস,
মন ফাগুনের মাস
ভালোবাসব -বারোমাস।।

।।আমার মেয়েবেলার গল্প।।

"আলো ক্রমে আসিতেছে। এ নভোমণ্ডল মুক্তাফলের ছায়াবৎ হিম নীলাভ। আর অল্পকাল গত হইলে রক্তিমতা প্রভাব বিস্তার করিবে, পুনর্ব্বার আমরা, প্রাকৃতজনেরা, পুষ্পের উষ্ণতা চিহ্নিত হইব। ক্রমে আলো আসিতেছে।"

পাহাড়ে সুর্যোদয় দেখেছেন কখনও। বরফচূড়ায় সোনারঙা রোদ ছড়িয়ে পড়ে যখন,এক অপার্থিব সৌন্দর্য। ঠিক সেইরকম ই ছিল আমার মেয়েবেলা।সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবার।দুকামরার ভাড়াবাড়ি।যৌথ পরিবার। এক ঘরে আমি,দিদি,বাবা,মা আরেক ঘরে দাদু,ঠাকুমা, দুই অবিবাহিত কাকা।বাড়ির পেছনেই একটা বড়ো পুকুর আর তারই পাশে বস্তি।সেখান থেকেই আসত বাড়ির ঠিকে কাজের লোক।সেই বস্তির তাবৎ ক্ষুদেরা আমার জিগরি দোস্ত ছিল।আড়ম্বরহীন অথচ আনন্দে মাখামাখি ছিল আমার শৈশব, কৈশোর কারণ সেখানে যাদুকরী ভাসিলিসা ছিল,ক্ষুদে ইভান-বড়ো বুদ্ধিমান ছিল, আলিওনশুকা-ইভানুশকা,পাগলা দাশু, বুড়ো আঙলা,হর্ষবর্ধন-গোবর্ধন,ছিলেন ডি ভি পালুসকার,ভীমসেন যোশী, হাবিব তানভীর, দস্তোভস্কি,তুর্গেনিভ, চার্লি চ্যাপলিন,জীবনানন্দ দাশ, দেবব্রত বিশ্বাস,ফিরোজা বেগম।আজ্ঞে না,এই সবকিছুর রসাস্বাদন করার মেধা তখনও তৈরী হয়নি।কিন্তু চর্চা হোতো বাড়িতে,তাই মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়,নরেন্দ্র নাথ মিত্র, সতীনাথ ভাদুড়ি, সুবোধ ঘোষ,কমলকুমার মজুমদার আমার সঙ্গেই থাকতেন আবোলতাবোল,রুশদেশের উপকথা,ঠাকুরমার ঝুলি,শুকতারা, চাঁদমামা,আলোর ফুলকির সঙ্গে।

আমার ঠাকুমা কে দেখতাম দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর শুকতারা,দেশ পড়তে। অসাধারণ রান্না করতেন যৎসামান্য উপকরণে।বাড়ির সদস্যদের সঙ্গে অতিথি অভ্যাগতদের আতিথেয়তায় কোনো খামতি থাকত না।বাঙাল বাড়ি,তাই কেউ এলেই "দুপুরে একটু ভাত খাইয়া যাইও" বলার রেওয়াজ ছিল।উনুনে রান্না হোতো।মা,ঠাকুমা কয়লা ভাঙতেন,গুল দিতেন।কয়লা,গুল,ঘুঁটের স্তরবিন্যাস মুগ্ধ হয়ে দেখতাম। আর গুল দিতে কি যে ভালো লাগত।ঠাকুমার কাছে গল্প শুনতাম ঢাকা,ময়মনসিংহ,রংপুরের।ফুটবলে ইস্টবেঙ্গল জিতলে অপার আনন্দ আর হারলে "আমি রব নিস্ফলের,হতাশের দলে"।মহালয়ার দিন ভোর চারটেয় উঠে ঠাকুমা উনুনে শুধু ঘুঁটের আগুন দিয়েই চা বানাতেন। সবাই

রেডিও শুনতে বসতাম।আমাকেও একটু চা দেওয়া হোতো।আধোঘুমের মধ্যে সেই স্বর্গীয় সুরের বিন্যাস এক অতিপ্রাকৃত অনুভূতির জন্ম দিত।

বাড়িতে অতিবাম রাজনৈতিক সংস্কৃতির চর্চা ছিল।সত্তরের উত্তাল ঢেউয়ে ভেসে গিয়েছিলেন দুই কাকাও।আমার যখন বছর তিনেক ,তখন বড়কাকা ফিরলেন সাড়ে নয় বছর পর জেল খেটে।এসেই কোলে তুলে নিয়েছিলেন আমায়।তিনি ছিলেন আমার প্রাণের বন্ধু।ছোটকাকাও জেল খেটেছেন মাস খানেকের জন্য। বসুমতীতে চাকরি করতেন।লোডশেডিং হলে কুপির আলোয় মা ঘেমেনেয়ে রুটি করতেন আর আমাকে চক দিয়ে মেঝেতে লিখে অআকখ শেখাতেন।আমার ছোটকাকা সাহায্য করতেন মাকে।কালীপুজোয় বাজি কিনে দিতেন ছোটকাকা।মুখে বলতেন "বাজি ফাটায় পাজিতে"..কিন্তু কিনে ঠিক আনতেন আর আমাদের সঙ্গত ও করতেন বাজি ফাটানোয়।আমার ছোটবেলায় দূর্গাপূজোর শ্রেষ্ঠ জামাটাই কিনে দিতেন ছোটকাকা।

পুকুরের পাশে ঘন আগাছার জঙ্গল ছিল।জানলার গরাদ দিয়ে আমি দেখতাম আর ভাবতাম "ঐখানে মা পুকুর পারে,জিওল গাছের বেড়ার ধারে,হোথায় হবো বনবাসী, কেউ কোথ্থাও নেই.."জঙ্গল পেরোলেই এক আদিগন্তবিস্তৃত মাঠ।ওটাই ছিল আমার সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারের তেপান্তরের মাঠ।তারই এক কোণে দাদু একটি অবৈতনিক প্রাইমারি স্কুল বানিয়েছিলেন।এক তথাকথিত মস্তান (?) খুব সাহায্য করেছিলেন দাদু কে।

অনেক পুতুল ছিল আমার। কাকাদের খাটে তাদের শোয়ার ব্যবস্থা ছিল। কাকারা এককোণে গুটিশুটি মেরে শুয়ে থাকতেন।আর ছিল রান্নাবাটি খেলা। বড়কাকার বন্ধুরা আমার ছেলেমেয়ের বহর আর রান্নায় পারদর্শীতার জন্য আমায় মাসিমা বলে ডাকতেন।মা ছিলেন আমার দেখা সেরা সুন্দরী..আর খুব সুন্দর গান গাইতেন,আবৃত্তি করতেন,গল্প বলতেন। মা উল বুনছেন আর গান গাইছেন "মনে পড়ে সন্ধ্যাবেলায়,সময় হোলো প্রদীপ জ্বালার,তারি আলোয় আমরা কজন শুনছি কথা মনিমালার.." দিদি আমার থেকে বছর ছয়েকের বড়ো,দিদিগিরি তে সাঙ্ঘাতিক দড়।আমি বিশেষ পাত্তা পেতাম না।আর বাবা রাশভারি ছিলেন।আমি বেশ ভয়ই পেতাম।বাড়িতে লক্ষীপূজোয় একটা পিতলের সরায় ঠাকুমা খই এর উপড়া,নারু বানাতেন। মা কোমরে আঁচল জড়িয়ে খিচুড়ি ভোগ রাঁধতেন।বাড়িতে খাটের তলায় বড়ো বড়ো ট্রাঙ্ক ভর্তি

ছিল বই,দেশবিদেশের।সেখান থেকেই একদিন পেলাম গল্প গুচ্ছ।সহজ পাঠের পর প্রথম রবিঠাকুরের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ। অবশ্য মায়ের সৌজন্যে গীতবিতান, সঞ্চয়িতার সান্নিধ্য ও পেতাম।

সেই সময় পাড়ায় পাড়ায় মারামারি,খুনোখুনি লেগেই থাকত। হঠাৎই শুরু হয়ে যেত বোমা বা পেটো ছোড়াছুড়ি।সেসময় জানালাদরজা বন্ধ করে বসে থাকতাম কিছুক্ষণ।তারপর আবার স্বাভাবিক সব কিছু ।তবে খুনখারাপি হলে পাড়াটা থম মেরে থাকত।পুলিশ আসত।আমার জ্ঞানত প্রথম খুন যিনি হয়েছিলেন, তার নাম ছিল বুলগানিন।বাকি সব খুনে মস্তানদের হাবিজাবি নাম ছিল যেমন নিকুঞ্জ, মনা পোদ্দার, বাপি,বুনো,হাবু ইত্যাদি।খুনের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ পাওয়া যেত গৃহসহায়িকাদের কাছে।তারা সেদিন ফ্রেন্চ লিভ নিতেন। একবার তো আমাদের বাড়ির উঠোন দিয়েই খোলা তরোয়াল নিয়ে ছোটাছুটি। ভয়ে সিঁটিয়ে গিয়েছিলাম। তবে যাকে খুন করতে এসেছিল,তাকে না পেয়ে দাদুর স্কুল টাই পুড়িয়ে দিল।দাদু খুব দুঃখ পেয়েছিলেন।মাননীয়ার অনেক আগেই আমাকে অনুপ্রাণিত করেছিল মরি নামের এক কিশোরী।পেটো ছোঁড়ায় মারাত্মক দক্ষ ছিল।প্রতিপক্ষ কে নাস্তানাবুদ করে ছাড়ত।আমি বড়কাকার মতো হব না কি মরির মতো,সেই নিয়ে সংশয়ে ছিলাম।

বাবা রিডার্স ডাইজেস্ট পড়তেন এবং সেখান থেকে ডিক্টেশন লিখতে বাধ্য করতেন।উদ্দেশ্য হোলো শব্দ ভান্ডার সমৃদ্ধ করা এবং দ্রুত লেখার অভ্যাস তৈরী করা।আমার খুবই অপছন্দের ছিল।একবার জন্মদিনে বাবা টেল মি হোয়াই এর পাঁচটি খন্ড উপহার দিলেন।কিন্তু আমি বিপদের পূর্বাভাস পেলাম। ডিক্টেশন লেখার নতুন উৎস হাজির।বাবার ছিল ট্রান্সফারেবল জব।পয়লা ভাদ্র,অগস্ত্য যাত্রার দিন,বাবা রওনা দিলেন পাটনা।ঝমঝমে বর্ষার মধ্যে বড়কাকা গেলেন বাবা কে ট্রেনে তুলে দিতে।মা,ঠাকুমার মনখারাপ।মা গেয়েছিলেন "নিদ নাহি আঁখিপাতে,তুমিও একাকী,আমিও একাকী,আজি এ বাদল রাতে.."এর কত বছর পরে শ্রীজাতর লেখায় পড়লাম "বিরহ ঠিক কেমন হবে,দরজি নিলেন চোখের মাপ

কোথাও একটা মন ভেঙেছে। আমরা ভাবি নিম্নচাপ।"
শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় এবং লীলা মজুমদার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আমার ভুতের ভয় দূর করতে পারেন নি।লোডশেডিং হোতো হরবকত।কুপি,লন্ঠনের আলোয় অন্ধকার যেন আরও রহস্যময় লাগত।আলো আসার সঙ্গে সঙ্গে পিছনের বস্তি

হর্ষধ্বনি উঠত।আমিও হাঁফ ছেড়ে বাঁচতাম।সত্যজিৎ রায়,মৃণাল সেন,তপন সিনহা,এবং দ্য ঋত্বিক ঘটক দেখার অনুমতি ছিল।তার মধ্যেই লুকিয়ে চুরিয়ে রেডিও তে শুনেছিলাম অঞ্জন চৌধুরীর শত্রু।খুব কান্না পেয়েছিল।

এরই মধ্যে আমরা একটু "পশ" পাড়ায় চলে এলাম।একটি বাড়ির পুরো দোতলাটা ভাড়া নিয়ে।নতুন বন্ধু হোলো।কিন্তু পুরোনো বন্ধুরা আমাকে এড়িয়ে চলতে লাগল।তখন বুঝিনি কেন??পরে বুঝেছিলাম এরেই কয় শ্রেণীসচেতনতা।কারণ বড়কাকা পরিচয় করিয়েছিলেন বুর্জোয়া,প্রলেতারিয়েত,অপ্রেসর,অপ্রেসড,পাওয়ার ডায়ানামিক্স,শ্রেণীসংগ্রাম, বিপ্লবী,প্রতিক্রিয়াশীল ইত্যাদি শব্দগুচ্ছের সঙ্গে।বড়কাকার কাছেই শোনা আইনস্টাইন,ওপেনহাইমার,স্টিফেন হকিং,স্রুডিংগারের গল্প একদিকে,আরেকদিকে মার্ক্স, লেনিন,স্তালিন,চে গেভারা,ফিদেল কাস্ত্রো,গ্রামসির গল্প। গল্পের লোভেই স্কুলে যাওয়ার বা ফেরার সবথেকে প্রিয় সঙ্গী ছিলেন বড়কাকা।ঠাকুমাও মন্দ ছিলেন না।বেলের আইসক্রিম কিনে দিতেন।

যাই হোক ,নতুন বাড়িতে আমার খেলাধূলার আঙ্গিক ও বদলে গেল।স্কুল থেকে ফিরে প্রায় রোজই আমার আর মায়ের বিচিত্রানুষ্ঠান হোতো।দুজন পার্টিসিপেন্ট,মা গাইতেন,আমি নাচতাম।আর হ্যাঁ,অডিয়েন্স ও আমরা দুজনই। মাঝে মাঝে মা শাড়ি দিয়ে ঘর বানিয়ে দিতেন।আমি একাই খেলতাম। বিকেলে অবশ্য বন্ধুদের সাথেই খেলতাম। মাঝে মাঝে বাবা সিনেমা দেখতে নিয়ে যেতেন।গানস অব নবারুন,ম্যাকানাস গোল্ড, বেনহুর, দি গ্রেট ডিক্টেটর,মর্ডান টাইমস,সিটি লাইটস....আমিনিয়াতে খেতাম আমিনিয়া স্পেশাল।
দিদি গান শিখত বাবারই এক ভাতৃপ্রতিম বন্ধু মনিকাকার কাছে।খুব যত্ন করে শেখাতেন রাগ,ঠাট, রবীন্দ্রসঙ্গীত, নজরুলগীতি, আধুনিক। আমি একলব্য হওয়ার চেষ্টা করতাম কেননা তখনও আমাকে তালিম নেওয়ার যোগ্য মনে করেননি অভিভাবকরা।আমার মামার বাড়ি ছিল মাহেশে,শ্রীরামপুরে, গঙ্গার পারে।সে ছিল আমার শৈশবের "অ জানি দেশের না জানি কি".. সেখানে থাকতেন আমার বড়োমামা।ব্যাচেলর মানুষ। সেন্স অব হিউমার ছিল অসাধারণ। ভারি প্রিয় মানুষ ছিলেন আমার। সখ ছিল বই কেনা।তাঁর সংগ্রহ থেকেই পড়া বঙ্কিমচন্দ্র,শরৎচন্দ্র ,শরদিন্দু, বিভূতিভূষণ ,তারাশঙ্কর,সত্যজিৎ..তারপর হঠাৎই একদিন নিজের অজান্তেই বড়ো হয়ে গেলাম।
"ঘনিয়ে এলো ঘুমের ঘোর, গানের পালা সাঙ্গ মোর.."

-দেবযানী ভট্টাচার্য

পাখিসব করে রব রাতি পোহাইল
কাননে কুসুমকলি সকলই ফুটিল
রাখাল গরুর পাল লয়ে যায় মাঠে
শিশুগণ দেয় মন নিজ নিজ পাঠে

পঞ্চাশোর্ধ যে সব মানুষ আছেন, যাঁরা শিক্ষার আলোকে এসেছেন, তাঁরা প্রত্যেকেই এই কবিতার সাথে পরিচিত। কবির নাম জানা নাও থাকতে পারে কিন্তু কবিতা টি সকলের পরিচিত এবং অত্যন্ত প্রিয়।কবির নাম মদন মোহন তর্কালঙ্কার।জীবনকাল ১৮১৭ থেকে ১৮৫৮।অর্থাৎ দুশো সাত বৎসর অতিক্রান্ত। জন্ম নদীয়া জেলার বিল্বগ্রামে, বাবা,রামধন চট্টোপাধ্যায়।

১৮৬৫ সালে ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 'বর্ণপরিচয়' প্রকাশ হয়।এর আগে শিশুশিক্ষা প্রবেশিকা প্রকাশ হয়েছিল মাত্র সতেরোটি।প্রথম টি ১৮১৬ সালে খ্রীষ্টান মিশনারীদের দ্বারা প্রকাশিত ---- লিপিধারা নামে আর সতেরো নম্বর টি মদনমোহন তর্কালঙ্কার প্রণীত ' শিশুশিক্ষা '(তিন ভাগ) ১৮৪৯ সালে। অবশ্য শিশুশিক্ষা র জন্য হাতে লেখা পুঁথি ছিল অসংখ্য। বর্ণপরিচয়ের আগে মদনমোহনের শিশুশিক্ষা র তিনটি বই ছিল শ্রেষ্ঠ ও জনপ্রিয়তম।

মদনমোহন বয়সে বিদ্যাসাগরের চেয়ে তিন বছরের বড় হলেও, তাঁর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। শিক্ষাবিদ, সমাজ সংস্কারক, শিক্ষা প্রসারক ও নারী শিক্ষার প্রসারে তাঁর নিজস্ব অগ্রণী ভূমিকা ছিল। তখনকার প্রতিটি সচেতন মানুষ নারীশিক্ষা প্রসারে স্ব স্ব ভূমিকা পালন করবার চেষ্টা করেছিলেন। আর তর্কালঙ্কার মহাশয় গ্রাম থেকে নিজের দুই মেয়ে ভুবনমালা ও কুন্দমালা কে নিয়ে এসে 'ক্যালকাটা ফিমেল স্কুল ' যার বর্তমান নাম বেথুন স্কুল, সেখানে ভর্তি করেছিলেন। এই স্কুলে সঠিক ভাবে শিশুশিক্ষার জন্য তিনি,'শিশুশিক্ষা' বই প্রণয়ন করেছিলেন। বেথুন সাহেবের এই স্কুলে তিনি বিনা বেতনে শিক্ষকতা করতেন। তিনি কবিতা লিখে প্রভূত সুনাম অর্জন করেছিলেন। রসতরঙ্গিনী, বাসবদত্তা তাঁর লেখা দুটি বহুল প্রচলিত কাব্যগ্রন্থ।

সবসময়ে তিনি অন্যতম সেরা পন্ডিত হিসেবে স্বীকৃত ছিলেন।

১৮৪৬ সালে বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারী, তাঁকে অনুরোধ করা হলো,এই পদ ছেড়ে তিনি সাহিত্যের অধ্যাপনা করুন। বিদ্যাসাগরের প্রস্তাব ছিল কলেজে সাহিত্যের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত করা হোক মদনমোহন তর্কালঙ্কার কে। মদনমোহন তখন কৃষ্ণনগর কলেজে প্রধান পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত। শেষপর্যন্ত বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টায় ১৮৪৬ সালের ২৭শে জুন মদনমোহন সংস্কৃত কলেজে সাহিত্যের অধ্যাপক নিযুক্ত হন।বিভিন্ন কারণে ১৮৫০ সালে এই পদ ছেড়ে তিনি মুর্শিদাবাদে চলে যান জজপন্ডিতের পদ গ্রহণ করে'।নবজাগরণের জোয়ার তখন, যার মূলমন্ত্র ছিল অবাধ বানিজ্য এবং তার প্রধান মূলধন, বিত্ত এবং বিদ্যা।১৮৪৭ সালের গোড়ার দিকে বিদ্যাসাগর 'সংস্কৃত প্রেস ও ডিপোজিটরি ' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, ব্যবস্থাপনায় মূল উদ্যোগ ছিল মদনমোহনের এবং দুজনেই সমঅংশভোগী ছিলেন।

বর্ণপরিচয়ের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় শেষ পর্যন্ত মদনমোহনের 'শিশুশিক্ষা' দাঁড়াতে পারেনি।যেহেতু শিশুশিক্ষা আগে প্রকাশিত তাই বর্ণপরিচয় তার কাছে ঋণী।অনেকেই মনে করেন, শিশুশিক্ষা বেশি চিত্তাকর্ষক ছিল। তাতে প্রচুর নীতিশিক্ষা ছিল,মিল বসানো বাক্যের দ্বিপদী ছিল, বর্ণপরিচয়ে যেন শিশুরা কিছুটা বঞ্চিত।

বেশ কিছু সাহিত্যিক শিক্ষাবিদ এর অভিমত, মদনমোহনের বিশাল পান,কবিত্ব ও সমাজ সংস্কারকের ভূমিকার থেকেও শুধুমাত্র শিশুশিক্ষা বই এর জন্য তিনি চিরস্মরণীয়। তাঁর দ্বিশতবর্ষ উদযাপনে কলকাতায় কয়েকটি আলোচনা সভা হয়েছে।দু তিনটি বই ও প্রকাশ হয়েছে।এর মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ' দ্বিশতবর্ষে তর্কালঙ্কার '।

বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ বই তে,বিনয় ঘোষ মহাশয়ের অভিমত, 'বিদ্যাসাগর ও মদনমোহন ছিলেন একবৃন্তের দুটি ফুল '।

-দীপিকা সামন্ত

মুখোশ

নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সংসারে বাস করতে গেলে একটু-আধটু অভিনয় করতেই হয়। সকলেই ভালোভাবে উৎরেও যান। প্রপস-মেকআপ-ড্রেস -- কিচ্ছু লাগে না। এনিয়ে নরেন্দ্রনাথ মিত্রের দারুণ একটা গল্প আছে -- অভিনেত্রী। সে গল্প নিয়ে টেলি-সিরিয়ালের একটা এপিসোড বানিয়ে ছিলেন সত্যজিৎ রায় স্বয়ং। মাতা জগজ্জননী অবশ্য এতে তেমন কিছু মনে করেন না। বরং যেন উপভোগ-ই করেন এই নাটক-নাটক খেলা।

অনেকে কিন্তু আবার এমন অনাড়ম্বর অভিনয় পছন্দ করেন না। ড্রেস-প্রপসের তেমন সুবিধে না থাকায় তাঁরা মেকআপ করতে বসেন। বলা ভালো -- হলিউডি মেকআপ আর্টিস্টদের মতো 'মাস্ক' ব্যবহার করেন। গোদা বাংলায় যাকে বলে 'মুখোশ' আর কী। মাস্ক লাগিয়ে মেকআপ করা যথেষ্ট কষ্টদায়ক বই কী। আর তাঁরা অভিনয়টা-ও করেন জব্বর। সে এমন জব্বর যে -- এক সংসারে দশকের পর দশক কাটিয়ে ফেললেও অভিনয় বলে চেনা যায় না। আসল মনে হয়। এতটা বাড়াবাড়ি আবার মাতা জগজ্জননীর না-পসন্দ।

তবুও, তবু-ও 'মাতা' সন্তানের শুভবুদ্ধির উদয়ের জন্য অপেক্ষা করেন। তিনি চান - সন্তান নিজের থেকেই খুলে ফেলুক এই মুখোশ। কিন্তু মুখোশ পড়ার মতো, মুখোশ খোলাও খুব-ই যন্ত্রণাদায়ক। তার সঙ্গে কাজ করে সযতনে গড়ে তোলা ইমেজ, উচ্ছন্নে যাবার ভয়। তাই মুখোশ খুলতে চায় না সে। অযথা হয়ে ওঠে হিংস্র। কোনোমতেই শুভবুদ্ধির উদয় না হলে -- তখন 'মাতা' নিজ উদ্যোগে শুরু করেন মুখোশ খোলার কাজ।

-সোমদত্তা চ্যাটার্জী

ক্ষণকাল

পূর্বমেঘ উত্তরমেঘে ছাড়াছাড়ি হলে ঝড় নামে
অনির্দিষ্টকাল নীল দ্বীপে।

মৃত্তিকায় বয়ে গিয়েছিল যত
ধুলোবালি
সব কিছু ফিরে আসে ঠিক
সেই বেদনাহত নীলে
ভুল অন্তরীপে।
খুঁজে ফেরে যাকে আবিশ্ব নিখিলে,
বলে, কোথায়, কোথায় সে সোনালী নাবিক?

ফিরে এলে, ডেকে নিয়ে কাছে
মাথা রাখে বুকে–
বলে অস্ফুটে, কী পরম সুখে
সে সর্ব বৈভব,
দুর্লভ তৈজসপত্র সব,
হারিয়ে বসে আছে!

-মহুয়া সেনগুপ্ত
শিলচর, আসাম

“पानी पानी रे, खारे पानी रे,
नयनों में भर जा,
नींदें खाली कर जा...”

গানটা গাড়ির সাউন্ড সিস্টেমে শুনছিলাম বসে বসে। জল্পেশ শিব মন্দির থেকে আরো ছ'কিলোমিটার খানেক ভেতরে গেলে পড়ে জটিলেশ্বর শিব মন্দির। প্রাচীনত্ব এবং ঐতিহাসিক দিক থেকে জল্পেশের চেয়েও অনেক বেশি তাৎপর্যপূর্ণ এই মন্দির। আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়ার বোর্ড লাগানো আছে এখানে।

ওখানেই গিয়েছিলাম আমি। ফিরতি পথে একটা গাছের ছায়ায় গাড়িটা দাঁড় করিয়ে মনোরম গোধূলি উপভোগ করছিলাম। ঠিক তখনই গানটি বেজে উঠেছিল।

২০২০ র শেষ থেকে প্রায় ষোল মাসের কিছু বেশি সময় ধরে আমাকে পড়ে থাকতে হয়েছিল উত্তরবঙ্গে। কর্মসূত্রে ঘুরতে হয়েছিল বাংলাদেশ লাগোয়া এমন প্রান্তিক কিছু গ্রাম, জিপিএস যেখানে ঠিকমতো কাজ করে না, নেই কোনো মোবাইল নেটওয়ার্ক। বাবা সে'সব জেনে যেতে পারেননি। ২০২০ সালের জুন মাসের ১১ পুহিয়ে সবে ১২ য় পড়েছে। রাত বারোটা বেজে চল্লিশ মিনিটে আমি তখন আমার ঘর লাগোয়া পেছনের বারান্দায় রাতের শেষ সিগারেট খাচ্ছি। হঠাৎ শুনি বাবা 'ওফ্ ওফ্' করতে করতে হাঁফাতে হাঁফাতে এসে দরজার সামনে থেকে কোনোমতে 'অ্যাই' করে চিৎকার করে ডেকে উঠলেন। আমার বুকুন নামটুকু উচ্চারণ করে ডাকার মতো অবস্থায় তিনি ছিলেন না সেই মুহূর্তে।

ছিটকে বেরিয়ে এসেছিলাম। আমি আর আমার স্ত্রী জয়ী। দোতলার উত্তরের ঘরে বাবা শুতেন। আমি আর জয়ী মাঝের ডাইনিং পেরিয়ে দক্ষিণের ঘরে। নীচের দক্ষিণের ঘরে শুতেন আমার মা। যেখানে তিনি এখনো থাকেন, যেখানে এখনো বাবা-মায়ের বিয়ের খাটটি রাখা আছে।

দু'দু'খানা সরবিট্রেট মুখে দিয়েও বুকের ধড়ফড়ানি কমানো গেল না। এদিকে লকডাউন তখনো পুরোপুরি না ওঠায় অতো রাতে অক্সিজেন বাড়ন্ত। অনেক কষ্টে বাবাকে দোতলা থেকে নীচে নামালাম। ধরে ধরে

বাবাকে নামাচ্ছি নীচে, আর বাবাও আমাকে শেষ অবলম্বনের মতো আঁকড়ে ধরে বাঁচতে চাইছেন। আমি শক্ত করে ধরে আছি দু'হাতে তাকে, আর বলছি, ভয় কী বাবা? এই তো আমি আছি!

গাড়িতে উঠতে গিয়েই বাবার পায়খানা বেরিয়ে গিয়েছিল। আমি গন্ধ পেয়েছিলাম। মুখে কিছু না বলে কাচ নামিয়ে এসি ফুল স্পিডে চালিয়ে ঝড়ের বেগে গাড়ি চালালাম। যতোটা ঝড় তোলা সম্ভব ছিল খানা-খন্দ-স্পিড ব্রেকার আর ভাঙা মাঝের হাট ব্রিজ বাঁচিয়ে বি এম বিড়লা অবধি নিয়ে যেতে। তবু যেতে যেতেই বুঝেছিলাম বাবা আর নেই। বড়ো ভালোবাসার ছিল এই গাড়িটা তাঁর। মুম্বাইয়ে কিনেছিলাম তাঁকে কিচ্ছুটি না জানিয়ে। যেদিন কলকাতা থেকে উড়ে গিয়েছিলেন মা'কে নিয়ে, সারপ্রাইজ দিতে এয়ারপোর্টে নিয়ে গিয়েছিলাম। চড়ে তাঁর সে কী খুশি! বারবার বলতেন বড্ড ভাল হয়েছে গাড়িটা, বড়, উঁচু, চওড়া। অমনি আমারও বুকের পাটা চওড়া হয়ে যেত সে'কথা শুনে।

সেই গাড়ি নিয়েই দাঁড়িয়েছিলাম জলপাইগুড়ি জেলার জল্পেশ আর জটিলেশ্বর মন্দিরের মাঝামাঝি। গানটা শুনতে শুনতে চোখ জলে ভরে উঠল অকস্মাৎ! অথচ লতা মঙ্গেশকরের এই গানটি কতবার কত জায়গায় যে শুনেছি! বাবা বলতেন লতা এত কুৎসিত দেখতে, অথচ গলায় দেখো মা সরস্বতীর বাস! মনে হল যেন আমার ঠিক পেছনের সীটে বসে বাবাও গানটা শুনছেন। যেখানে তিনি শেষবারের মতো বসেছিলেন হাসপাতাল নিয়ে যাবার সময়।

লোকে বলে বাপ-মা চলে গেলে বোঝা যায় বটগাছের ছায়া সরে গেল। লোকে বলে বাবা হলে বুঝবি কী জিনিস! সাপের বাচ্চাকেও মারতে কষ্ট হবে, মনে হবে আহা! ওরও তো বাবা আছে।

বিয়ের সুদীর্ঘ ন'বছর পর ২০১৮ য় যখন প্রথমবার জয়ী কনসিইভ করল, আমরা তখন সবেমাত্র মুম্বই পৌঁছেছি। থিতু হতে পারিনি। মাত্র দেড় মাসের মাথায় যখন জানা গেল ফেটাস ডেড, আমরা তখন অসহায়, ছাতাহীন। বাড়িতে জানালাম। জানালাম যদি কেউ আসতে পারে, এসে থাকতে পারে, বাবা হার্টের পেশেন্ট হওয়ায় নিদেনপক্ষে মা অন্তত।

কিন্তু না, কেউই আসতে পারেননি। মা এসেছিলেন পরে, প্রায় মাসখানেক পরে। ডাক্তার বলেছিল জয়ীর ভেতরটা কাঁচা রয়ে গেছে ওয়াশের পর। ফলে দিন সাতেক রক্ত ঝরবে। দু'জনেই মানসিকভাবে বিধ্বস্ত তো ছিলামই। ওই অবস্থায় কখনো আমি, কখনো জয়ী সকাল-বিকেল সেদ্ধ ভাত খেয়ে চালিয়েছি। মুম্বাইয়ে থিতু হতে হতে সেই মুহূর্তে কোনো কাজের লোক কিংবা অন্য কিছু ঠিক করা সম্ভব ছিল না। টাকাও ছিল না একথা সত্যি। আর জয়ীর মায়ের পক্ষে আসা সম্ভব ছিল না। জয়ীর বাবা আমাদের বিয়ের আগেই চলে গিয়েছিলেন, আর মা ছিলেন নন-অ্যালকোহলিক লিভার সিরোসিসের পেশেন্ট, স্টেজ ফোর।
এই আঘাত আসলে আমাদের মানসিকভাবে প্রস্তুত করেছিল। ফলে বটগাছের ছায়ার অভাব আর কোনোদিনই অনুভূত হয়নি। তবে এখন, এতদিন পরে এই বিষয়টার অন্য ডাইমেনশনগুলি দেখতে পাই। অচেনা শহরে ওই অবস্থার সময় অসুস্থ বুড়োবুড়ি গিয়ে আরো বিড়ম্বনা বাড়তে পারে, হয়ত এই ভাবনা ছিল তাঁদের মনে। আর শোক তো ছিলই। এতদিন পরে বিষয়টি নিয়ে লিখলেও, বাবার প্রতি এ বিষয়ে আর কোনো অভিযোগ নেই আমার।

বরং ২০২০ তে বাবা চলে যাবার পর, একটা বিরাট শূন্যতা গ্রাস করলো আমায়। মনে হতো, এত যে গান, এত যে গায়ক-গায়িকা, কই, এই গানটা তো শোনানো হলো না বাবাকে? আলোচনা হলো না অমুকের গাওয়া গানটা নিয়ে। যেমন হয়েছিল ২০১৫ সালে আমার নতুন কেনা নীল রঙের সুইফট গাড়িতে তাজপুর যেতে যেতে। মা মামাবাড়ি যাওয়ায়, আমি, জয়ী আর বাবা দু'দিনের জন্য তাজপুর চলে গিয়েছিলাম। সারা রাস্তা বাবা রাগাশ্রয়ী গান গাইতে গাইতে গিয়েছিলেন। রসিক মানুষ প্রীতমের সুরে 'দিল মেরা মুফত কা' গানটি শুনে তারিফ করেছিলেন, জিজ্ঞেস করেছিলেন গানটা কে গেয়েছে তাই নিয়ে। মুখে বলেছিলাম জানি না, মনে ভাবছিলাম যে 'এজেন্ট ভিনোদ' মুভিটার এই গানটা যতবার আমি শুনি, করিনা কাপুরের পাশে মারিয়ম জ়াকারিয়ার স্তনের বিভাজিকার কথাই আমার বেশি মনে পড়ে, তাই গায়িকার খোঁজ আর নেওয়া হয়ে ওঠে না।

রসিক আমার পিতৃদেবও কম ছিলেন না। দোতলার ঘরে শিফট করে যাবার হয়ত ওটাও একটা কারণ ছিল। ধরে ফেলেছিল জয়ী। আমাকে চুপিচুপি জানিয়েছিল তার আর তার শ্বশুর মশাইয়ের অপ্রস্তুত অবস্থার

কথা। হাসতে হাসতে। কম্পিউটারে তাস খেলতে খেলতে তিনি উত্তেজক ওয়েব সাইট দেখতেন। পুত্রবধু হঠাৎ করে ঘরে ঢুকে পড়ায় বৃদ্ধ মানুষটি হিমসিম খেয়েছিলেন তা বন্ধ করতে গিয়ে। অবিশ্যি এমন ঘটনার আমিও সাক্ষী হয়েছিলাম আমার এক বন্ধুর বাবার মোবাইল ফোন ঠিক করতে গিয়ে।

ঠিক এই পয়েন্ট থেকে ভেবে দেখলে পৌরুষ একপ্রকার অভিশাপও বটে। একটা বয়সের পর, যৌবন না থাকলেও অসহায় বৃদ্ধগুলো ইন্দ্রিয়-যাতনা ভোগ করে চলেন। আমরা তথাকথিত সভ্য পুরুষেরা শুধু সমাজে ডিগনিটির মুখোশটুকু ঠিক ঠাক ধরে রাখতে পারি এইটুকুমাত্র। আর আড়ালে নিজের ইন্দ্রিয়ের কাছে নগ্ন সমর্পিত হই।

বাবাকে নিয়ে লিখতে বসলে শেষ হবার নয়। ছোটোবেলায় রাসবিহারী চত্বরে থাকতাম। খাকি রঙা হাবিলদার হাফ প্যান্ট পরে বাবার সাথে মার্চ করতে করতে যেতাম ইস্কুলে। তখনও কলকাতা ফ্ল্যাট বা অ্যাপার্টমেন্ট কালচারে অভ্যস্ত হয়নি এতটা। বড় বড় বাড়ির এক একটা গাড়ি-বারান্দা হতো মেট্রোরেলের স্টেশন। আর আমি সাজতাম মেট্রোরেল। দৌড়োতে দৌড়োতে ওইসব স্টেশনে ঢুকে জিরিয়ে নিতাম খানিক। পিছিয়ে পড়া বাবা ততক্ষণে আমায় ছুঁয়ে ফেলতেন। মধুমন্তি মৈত্র'র বলা কথাগুলি আউড়ে, ফুটপাথের বামদিকে কাল্পনিক যাত্রী নামিয়ে-উঠিয়ে আবার রওয়ানা দিতাম গন্তব্যের উদ্দেশ্যে। বাবার সাথে ট্রাম ধরে বাড়ি ফিরবো বলে।

একদিন ট্রামের পয়সা ফুরিয়ে গিয়েছিল। আমি জেদ ধরলে গড়িয়াহাট থেকে অনেকটা লিচু কিনে ফেললো বাবা। পকেটে পয়সা শেষ। সেদিন ফার্ন রোডের জগবন্ধু ইন্সটিটিউশন থেকে ক্যাওড়াতলার মোড় হেঁটে ফিরেছিলাম। তখন আমি ক্লাস থ্রি।

যখন আমার ক্লাস ফাইভ, তখন একবার রক্ত আমাশায় কাহিল। আমাকে ট্রামে করে বাবা বেহালা থেকে কালীঘাটের সিজিএইচএস-এ নিয়ে গিয়েছিলেন ডাক্তার দেখাবেন বলে। নতুন বাড়ি করায় ঋণে জর্জরিত মানুষটা আমায় শিখিয়েছিলেন অন্যমনস্ক হয়ে কীভাবে মলত্যাগের বেগ সামলাতে হয়। গিয়েছিলাম। ফিরেও এসেছিলাম।

ওষুধ খেয়ে সুস্থও হয়েছিলাম। আজও আমায় এই শিক্ষা উপকার দেয়। কর্মক্ষেত্রে এমনও দিন গেছে, উপায় না থাকায় সারাদিন বেগ চেপে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে সন্ধ্যেবেলায় হোটেল কিংবা বাড়িতে ফিরে মলত্যাগ করেছি। বাবাই শিখিয়েছিলেন - চাইলে মানুষ সব পারে!

আরেকটি ঘটনা ২০০৮ সালের। তখনো আমার বিয়ে হয়নি। বাবা ইস্কিমিক হার্ট প্রবলেম নিয়ে নার্সিং হোমে ভর্তি। বাড়িতে আয়কর দপ্তরের কমিশনারের থেকে চিঠি এল। বাবার পাংকচুয়ালিটি নিয়ে ওয়ার্নিং লেটার। মাকে জিজ্ঞেস করলাম, কী ব্যাপার? মা বললেন, অফিসের কলিগ ফোন করেছিলেন। বললেন কিচ্ছু করার দরকার নেই। কমিশনার কিছুদিনের মধ্যেই বদলি হয়ে যাবেন। আমিও বাবাকে ওই অবস্থায় আর কিচ্ছু জানাইনি। খুব সম্ভব মা-ও। কমিশনার কিছুদিনের মধ্যেই বদলি হলেন। বুঝলাম, গালাগাল শুধু আমিই খাই না, চাকরিতে আমরা বাপ-ছেলে সব্বাই চাকর।
এর চেয়েও মারাত্মক ঘটনা ঘটেছিল ২০১৯ সালে। ততদিনে আমি মুম্বইতে থিতু হয়ে গিয়েছি। সিবিআই থেকে বাবাকে মুম্বইয়ের আয়কর দপ্তরের এক অ্যাডিশনাল কমিশনারের কাছে হাজিরা দিতে বলা হল। এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে তদন্ত চলছে যিনি কিছুদিন বাবার দপ্তরে কমিশনার র‍্যাঙ্কে কাজ করেছিলেন। সেই প্রথম আমার আই আর এস অফিসারদের সামনা সামনি টক্কর নেওয়া। বাদী ও বিবাদী পক্ষের উকিল (এঁরাও আয়করেরই লোক, সরকার পক্ষে একটি বাচ্চা ছেলে, আর যার বিরুদ্ধে অভিযোগ, তার হয়ে এক রিটায়ার দুঁদে ব্যক্তি সওয়াল-জবাব করছিলেন) সহ অফিসার বেশ রাশভারী আওয়াজে সব শুরু করলেন। সকাল সাড়ে এগারোটা থেকে শুরু করে প্রায় দু'টো বাজার সময়ও যখন দেখলাম জেরা চলছে এবং বাবা টেম্পারামেন্ট হারিয়ে ফেলছেন, আসামী পক্ষের উকিল ক্রমাগত নাস্তানাবুদ করে চলেছেন বাবাকে একের পর এক প্রশ্নবাণ হেনে, তখন বাধ্য হয়ে আমায় আসরে নামতে হল। এবং ঘন্টাখানেকের মধ্যে নিজের কর্মক্ষেত্রের বহু লিগ্যাল কেসের অভিজ্ঞতা থেকে বাবাকে ঠাণ্ডা মাথায় বার করে নিয়ে এলাম ওই ঘর থেকে। কাজ তো একটাই ছিল। হরে দরে বাবার পক্ষ থেকে বুঝিয়ে দেওয়া যে ভাই, আমার বয়স হয়েছে, হার্টের পেশেন্ট, তায় বহু, বহু বছর আগের ঘটনা(কেসটি ২০০৪ সালের)।

তাই কী ঘটেছিল কিস্যু মনে নাই! ওষুধে কাজ হল। আর বাপ ছেলে সাড়ে তিনটের সময় ছুটি পেয়ে ভিলে পার্লের ফুটপাথে একে অপরের দিকে উল্টোমুখ করে সিগারেট টানতে থাকলাম। ছাড়া পাওয়ার সময় শুধু সরকারী অফিসারটি আমায় এক গাল হেসে বলেছিল, আপ থে ইসলিয়ে স্যর কো জলদি ছুটকারা মিল গ্যয়া!

ও নিজেও ছুটি পেয়েছিল আসলে, সেদিনকার মতো।
তবে বাবার থেকে সবচেয়ে বড়ো আঘাত পেয়েছিলাম তিনি চলে যাবার পর। ২০২০ র জুনে বাবা চলে গেল। জয়ীর মা গেলেন ২০২১ এ। আর ২০২২ এ প্রায় চল্লিশবছর বয়সে জয়ী দ্বিতীয়বার কনসিইভ করল। আমি বললাম, বাবা আসছেন। জয়ী বলল, ধ্যুত! আমার মা আসছে। আমি বললাম, তোমার শ্বশুর কিংবা আমার শ্বাশুড়ি যে-ই আসুক, একটা দিকের দুদু কিন্তু আমার। জয়ী বলল, ইশ!

সেপ্টেম্বরে পাঁচ মাস পুহিয়ে পঞ্চামৃত খেয়ে অ্যানোম্যালি স্ক্যানে সবকিছু ঠিকঠাক। বাড়িতে সাত মাসের সাধের দিনক্ষণ দেখা চলছে।
অ্যানোম্যালি স্ক্যানের ঠিক এক সপ্তাহের মাথায় জয়ীর হঠৎ দু'দিনের জ্বর... আর সব শেষ! রাত তিনটের সময় যতক্ষণে জয়ীকে একশো এক জ্বর নিয়ে পার্কস্ট্রিট নেওটিয়াতে ঢোকালাম, ততক্ষণে ভ্যাজাইনাতে ফেটাল পার্টস নেমে এসেছে।
তারপরের কয়েকটা ঘন্টা যমে-মানুষে যুদ্ধ চললো যেন। গলগল করে জয়ীর রক্তক্ষরণ, ওই জ্বর নিয়েও বাধ্য হয়ে জেনারাল অ্যানাস্থেশিয়া করে আটকে যাওয়া প্ল্যাসেন্টা রিমুভ্যাল আর ছিঁড়ে যাওয়া সারভিক্স সেলাই। আর জানতে পারা যে, বাবা-ই আসতে চেয়েছিলেন। আমার জ্যেঠতুতো দাদা হু হু করে কেঁদে ফেলেছিল শুনে। আমাদের নাকি বংশে অভিশাপ আছে, পরবর্তী জেনারেশনে কোনো ছেলে জন্মাবে না। জ্বলবে না বংশপ্রদীপ।

আমি সে'সব ভাবছিলাম না। জয়ী হাসপাতালে থাকার দিনগুলোতে প্রতি রাতে আকণ্ঠ মদ গিলেছি। ঘুমোবার জন্য। হাসপাতালের পরবর্তী ট্রিটমেন্ট তো সব মেয়েদেরই এক। শুধু অনেকেই বাচ্চাকে দুধ খাওয়াতে যেতে পারে, আর জয়ীর মতো অভাগা কারো কারোর সেই প্রয়োজনটুকু পড়ে না। আমার ডাক্তার দিদি আমায় বলল, কেঁদে নে। হাল্কা হবি। মুখে

বললাম, আশ্চর্য! আমার কান্না আসে না, তাও কাঁদবো? আসলে ওই সময় বাবাকেই খুঁজছিলাম। জানি অসুস্থ বয়স্ক মানুষটা কিছুই করতে পারতেন না, ঠিক যেমন ২০১৮ তেও পারেননি... তবু কোলে যখন তুলে নিতে পারলামই না, কোলে মাথা রেখে একটু কাঁদতে তো পারতাম?

আসলে পুরুষ মানুষদের একটু শক্ত হতে হয়। ফেটাসের বয়স ছাব্বিশ সপ্তাহের কম হওয়ায় বাবা সেটুকু অন্তত আমায় বাঁচিয়ে দিয়েছিলেন। নিজে হাতে আর গোর দিতে যেতে হয়নি। হয়ত অনেকটা অভিমান জমে ছিল তাঁর, কিংবা হয়ত ছিল এসেও আসতে না পারার ব্যর্থতার আক্ষেপ, দ্বিতীয়বার তাই আর আমার হাতের ছোঁয়া পেতে চাননি তিনি। একেবারে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাওয়ার হাত থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছিলেন আমায়।

-দেবতনু ভট্টাচার্য।

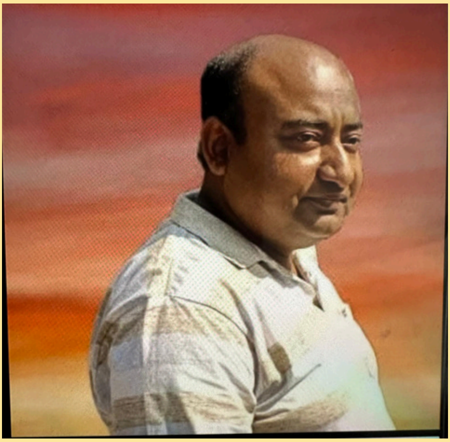

দূর

কাছে এলেও দূরত্ব
সহস্র যোজন!
শিরোনামে উৎসর্গপত্রে
যতটুকু ছোঁয়া!

লোকে দেখে শব্দ সারিসারি—
আমি দেখি আলো।

তুমি দেখো পাতাঝরা প্রণয়ের গাছে
থোপা থোপা অসময়ের ফুল ফুটে ওঠা।

-মহুয়া সেনগুপ্ত
শিলচর, আসাম

অমৃতস্য পুত্রী

ছোটবেলা নিজের নাম টা ভীষণ অপছন্দ ছিল। বাসে যেতে যেতে শবনম বেকারী দেখে প্রাণ টা হু হু করে উঠত। আহা কি সুন্দর নাম! ভোরের শিশির শবনম। আমার মা যে কোথা থেকে এই বিদ্ঘুটে পাঞ্জাবী নাম রাখলেন আমার। মাকে জিজ্ঞেস করাতে হেসে বলেছিলেন কবি অমৃতা প্রীতমের কথা্ । তার কবিতা পড়ে ভালোলাগার মুগ্ধতায় এই নাম দিয়েছিলেন আমাকে।

বড় হয়ে প্রায় যখন ভেবে ফেলেছি যে নাম পালটে সুচরিতা করে নেব, এমন সময় ট্রেনে দিল্লী যাবার পথে একজন আশ্চর্য যুবকের সাথে আলাপ হল। তার বাড়ি চন্ডীগড়। আমার জলহস্তীর মত সুটকেশ সে বার্থে তুলে সারা রাত দাঁড়িয়ে গল্প করে কাটিয়ে দিল এবং নামার আগে বুমেরাং টি মেরে গেল এই বলে “আরে ক্যা শরম কি বাত! আপকো তো পড়না চাহিয়ে,অমৃতা প্রীতম জী কি কবিতাঁয়ে, মশহুর কলমসীন ওউর আপকী নেমসেক ভী হ্যায়”। বোঝো! কেমন থাপ্পড় সবজান্তা বাঙ্গালিনীর গালে। সর্দারজী দের নিয়ে আর যদি কোনদিন জোক করেছি এরপর।

দিল্লীতে নেমেই বই টা কিনে পড়তে শুরু করলাম । রাতের বুক চিরে তীব্র হুইসিল বাজিয়ে গুমগুম করে ব্যথার পাঁজর গুঁড়িয়ে চলে যাচ্ছে দেশভাগের ট্রেন। সময়টা ১৯৪৭। পাকিস্তানের লাহোর থেকে ট্রেন চলেছে দিল্লীর দিকে। কিশোরী অমৃত কাউর বাবা কর্তার সিং হিতকারির হাত ধরে রাতের অন্ধকারে বুকে পুঁটলি চেপে পালিয়ে যাচ্ছে। পিছনে পড়ে রইল মন্ডি বাহাউদ্দিন গ্রামের সবুজ মাঠের ঘুঙ্গুর পরা ফসলের সোনালী দোলা দেওয়া খেতিবাড়ি। দিল্লীতে শরণার্থী শিবিরে হাহাকার। চূড়ান্ত নারকীয় পরিস্থিতি। হাজার হাজার ধর্ষিতা মেয়ের কান্নায়, আতংকের কালো রাত। অমৃতা কাঊর চুপ করে দেখেন। বুকের রক্ত মাখা পাতায় লিখে নেন তাদের স্বজন হারানোর গল্প। ফেলে আসা সন্তানের জন্য আর্তনাদ আর অজানা ভবিষ্যতের আশংকা। প্রলয় শান্ত হলে বাপ বেটির একটেরে সংসারে ছোট মেয়েটি গিন্নী সাজে। নিজের মত রাঁধে বাড়ে, যা থালায় দেয় বাবা সোনামুখ করে খান। আহা মা মরা মেয়ে যে! রাতে ডাল তড়কায় ফোড়ন দিয়ে মেয়েটি বাবাকে এক গাল হেসে বলে “ পিতাজী আপ কো

কাহানী শুনায়ে ?” সেই গল্পে রাত ভোর হয়। বাবা চুপিচুপি পান্ডুলিপি নিয়ে হাজির হন চেনা সাংবাদিক প্রীতম সিং এর দরবারে। জহুরী হিরা চেনে। কবিতা আর কবি দুজনের প্রেমে পড়লেন প্রীতম। অমৃতা হয়ে গেলেন অমৃতা প্রীতম। মাত্র ষোল বছর বয়সে প্রকাশিত প্রথম কাব্যগ্রন্থ “অমৃত কি লেহরে” । ১৯৩৬ থেকে ১৯৪৩ পর্যন্ত ছটি কাব্য সংকলন। পেছন ফিরে কোনদিন তাকাতে হয়নি।

তার ধারালো অকপট কলম লিখে চলে -
“আমার জিভ থেকে গড়িয়ে পড়ার আগে
যে শব্দ গুলো আত্মহত্যা করে
সেগুলো যদি বাঁচত আর কাগজের উপর নামতে পারত,
একটা খুন খারাবি হতেই পারত”

নিজের আত্মজীবনী “রসিদী টিকিটে” র পাতায় পাতায় হাসি মজার ছলে টাইম বোমার মত নারীর অবরুদ্ধ জীবনের ব্যথা গুলো সাজিয়ে রেখেছেন। না দেখে পা দিলেই বিস্ফোরণ হয়। যত দিন সংসার করেছেন ছেলে মেয়ে মানুষ করেছেন সে এক রকম। যেদিন ভাল লাগেনি আর, একদম ভণিতা আর ন্যাকামী করেন নি। তিনি ভালবাসার হাত ধরে চলে গেছেন ইমরোজের সাথে নতুন আলেয়ার খোঁজে। তাকে খারাপ বলবেন ? সমাজচ্যুত করবেন ? তাতে তার কিচ্ছু যাবে আসবে না। তিনি দারুণ হেসে বলবেন

“তোমাকে জড়িয়ে ধরব আশরীর
তাই ভাবছি রামধণুর একটা রঙ হব আর
নিজেকে আঁকব সেই রঙ্ দিয়ে তোমার ক্যানভাসে”

একে আপনাকে ভালবাসতে হবে। অসহায় ভাবে ডুবে যাবেন এর কবিতার পঞ্চনদীতে, রাতের অন্ধকারের স্বর্ণ মন্দিরের নিটোল সোনার ডোমটির মত সে ভেসে উঠবে আপনার কল্পনায়। সে বলবে,

“আমার তোমাকে মনে পড়ছে
ঠিক যেন আগুন কে আবার চুমু খেলাম
তোমার প্রেম যেন সেই অমৃত বিষের কাপ
যা আমি বার বার পান করি নিঃশেষে”

তার লেখা আমার একটি ভীষণ প্রিয় কবিতা ম্যায় তানু ফির মিলাঙ্গী।
তোমার সাথে আমার আবার দেখা হবে।

Main Tainu Fir Milaangi, Main tainu fir milaangi
Kithe? Kis trah? Pata nahi, Shayad tere takhiyl di chinag banke
Tere canvas te utraangi, Ya khore teri canvas dey utte
Ik rahasmayi lakeer banke, Khamosh tainu takdi rawangi
Main tainu fir milaangi

তোমার সাথে আবার দেখা হবে,
তোমার সাথে আমার বারবার দেখা হবে!
কবে? কোথায়, কিভাবে? কিচ্ছু জানিনা!
হয়তো তোমার কল্পনার এক রেশমি সুতো হয়ে
হয়তো নিজেই নিজেকে এঁকে ফেলব এক রহস্যময় রঙ হয়ে
যা কিনা তোমার ক্যানভাসে
একেবারে নিষিদ্ধ,
শুধু নীরবে চেয়ে চেয়ে দেখব তোমায়!
তোমার সাথে আবার দেখা হবে, তোমার সাথে আমার বারবার দেখা হবে!

Jaa khore suraj di lau banke
Tere ranga vich ghulangi
Jaa ranga diyan bahwa vich baithke
Tere canvas nu wlangi
Pata nahi kish trah-kithe
Par tainu zarur milangi.

হতেই পারি চোখ ঝলসানো , সোনালি সূর্য কিরণ,
দারুণ জ্বলন্ত রঙে রঙে ডুবে যাব তোমার ক্যানভাসে
লজ্জার মাথা খেয়ে , নিজেকেই বার বার আঁকব
তোমার ই ক্যানভাসে!
কবে? কোথায়, কিভাবে? কিচ্ছু জানিনা!
শুধু জানি তোমার সাথে আবার দেখা হবে,
তোমার সাথে আমার বারবার দেখা হবে!

Jaa khore ik chashma bani howangi
Te jivan jharneya da paani udd da
Main pani diyan bunda
Tere pinde te malangi
Te ik thandak jahi banke
Teri chhaati de naal lagaangi

একদিন হয়ে যাব দামাল, উচ্ছল এক পাহাড়ী ঝর্ণা
সহস্র মুক্তো সম জলকণায় ছিটকে পড়ব উদ্দাম কলতানে,
লক্ষ লক্ষ বিন্দুতে জীবনের সেই ধারাস্রোতে
আছড়ে পড়ব তোমার তপ্ত পিপাসিত বুকে!
নরম হিমেল পরশ তৃপ্ত মিলন হয়ে,

Main hor kuch nahi jaandi
Par ena jaandiyan
Ki waqt jo vi karega
Ae janam mere naal turega

আমি আর কিছু জানি আর না জানি
এটুকু নিশ্চিত জানি
সময় আমাকে কোন শিকলে বাঁধতে পারবেনা
আমি থাকব আজীবন তোমার সাথে
শুধু তোমার সাথে

Ae jism mukkda hai
Tan sab kuch mukk janda-e
Par cheteyan dey dhaage
Kaayenaati kana dey hunde
Main unha kana nu chunagi
Dhageyan nu walangi
Te tainu fir milaangi

এই দুরন্ত যৌবন একদিন চলে যাবে, সবার ই তো যায়।
কিন্তু আমার স্মৃতির যে রামধণু ঊর্ণনাভ জাল আমি বুনেছি

তিলে তিলে পলে পলে সেই মণিহারে
প্রতিটি মুক্তোর দানায়, আমি জড়িয়ে রাখব
আমাদের সেই সব অমূল্য সোনালি দিন
আমি গেঁথে রাখব এক এক করে!
আর তারপর?
তোমার সাথে আবার দেখা হবে,
তোমার সাথে আমার বারবার দেখা হবে!

এরকম উন্মাদ, একরোখা ভালবাসা কজন ই বা লিখতে পারে কবিতার খাতায় ? এই প্রত্যয়, এই সাহস তাকে আর সব কবির থেকে আলাদা আসনে বসায়। তার আবেগ কে তিনি নির্ভয়ে বেনীমুক্ত উদ্দাম কেশরাশির মত সন্ধ্যার আকাশে বিছিয়ে দিতে পারেন। দিনের শেষে নরম নীল সন্ধ্যায় সেই আকাশের তলায় একটি একটি করে তার আরো কবিতার নক্ষত্র গুলি জ্বলে ওঠে। আমি সামান্য মানুষ, অকিঞ্চিৎকর কবি চুপি চুপি ছাদে মাদুর পেতে বসি। হা করি দেখি আর পড়ি তার আকাশ জোড়া তারার লেখা। আমার উচ্ছ্বাস হেমন্তের শিশির মেখে আকাশ প্রদীপ হয়ে উড়ে যেতে চায়। আমি ভালবাসা লিখতে শিখি।

(এই কবিতার সঠিক অনুবাদ করা আমার মত সামান্য লেখিকার পক্ষে দুঃসাহসিক কাজ। তাই ভাবানুবাদের ছায়ায় চলেছি , আক্ষরিক অনু বাদের প্রলোভন উপেক্ষা করে।)

-অমৃতা মুখার্জী

সাধনা

জীর্ণ শরীরে, অনাহারে, ধুনির নিভুনিভু আগুন জ্বালিয়ে
একমনে কিসের সাধনায়
হে সন্ন্যাসী ,অনন্তকাল লীন আছো?
রকমারি তৈজসে সহস্র মনোহরা উপকরণে
যে আয়েসি জীবন
তাতে কিসের অনীহা?
সে কি জীবনের সারাৎসারের সন্ধানে?
নাকি বৃহত্তর আরো কিছু?
হায়রে! জীবন থেকে পালিয়ে
জীবনের মানে খোঁজা।
অথচ, অথচ সংসার চায় নির্লোভ
নির্মোহ তপস্বীর আশ্রয়
হায় সন্ন্যাসী! সে সত্যই বুঝলে না!

....

ওরা

গাছপালা নদীনালা রাস্তাঘাট -
কারোর সঙ্গে
সখ্য ছিল না তেমন করে, শৈশবে
ওরা ওরা - আমরা আমরা-
খেলতাম একসাথে সেইটুকুই
আর এখন, অজান্তেই
কখন যে পরম বন্ধু হয়ে গেছে
ছোটবেলার অনেক মানুষ হারিয়েছে সময়ের স্রোতে -
অথচ তারা বসে আছে স্থির,
যেন আবার একদিন দেখা হবে বলে।

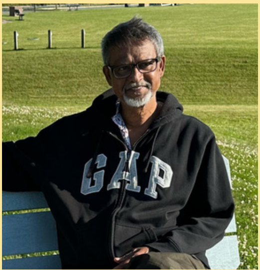

-মদন সামন্ত

আগমনী

উঠলো বেজে আগমনী সুর,
মন ভাসিয়ে কোন সুদূর,
চাইছি ছুতে ওই নীল আকাশ,
বইছে যেন খুশির বাতাস।।

শিশির ভেজা শিউলি ভোর,
সজীব করে মন কে মোর,
কাশবনের ওই কাশফুল ,
শরত আগমনে দেয় দোদুল।

সোনালি রোদ মারে উঁকি
মেঘেরা করছে ছুটোছুটি,
মা উমা যে আসছে ঘরে,
যেন একটুও ফাঁকি থাকেনা তাতে।।

প্রকৃতি যেন প্রাণ ফিরে পায়
শরৎ যখন নামে এ ধরায়,
মহালয়ার প্রাত করে জ্ঞাপন
তৈরি থেকো মা কে করতে বরণ।।

বছর ভর অপেক্ষা র পর
মা আসছে আপন ঘর,
সবাইকে মা সুখী রেখো;
দুর্গতি নাশ করে তবেই যেয়ো।।

-ঈশিতা রায়

শারদ শৈশব

শরৎ ঋতু মানে ই আকাশে বাতাসে বেজে ওঠে আগমনী সুর। ছড়িয়ে পড়ে আনন্দ ও উৎসবের আমেজ। নীল আকাশের পেজা তুলোর মত মেঘেদের দল জানান দেয় মা দুগ্গা এলো বলে।

আর এক নিমেষে আমরা ছুট্টে চলে যাই আমাদের শৈশব এ। শৈশবে র স্মৃতির পাতায় শরৎ ঋতু এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মনে পড়ে যায় কত স্মৃতি এই দুর্গোৎসব কে ঘিরে।

ছোটবেলায় শরৎ ঋতুর আগমনের বেশ কিছু দিন আগে থেকেই মন উদাস হয়ে যেত । দুগ্গা মা এর আগমনের কথা ভেবে মন নেচে উঠত। পড়তে বসলে চোখ বইয়ের পাতা থেকে জানলা দিয়ে চলে যেত নীল আকাশের পানে যেখানে সাদা মেঘেরা ভেসে বেড়াত যেন মায়ের আগমনের বার্তা বয়ে নিয়ে আসছে তারা। সাথে সাথে মন টা নেচে উঠত।

ঘর থেকে ছুট্টে চলে যেতাম ছাদে প্রাণ ভরে সেই মেঘেদের ছোটাছুটি দেখতে।

কখনো কখনো দূর এ কোন জায়গা থেকে মাইক এর গান ভেসে আসত , " গঙ্গা আমার মা , পদ্মা আমার মা, বন্ধ মনে দুয়ার দিয়েছি খুলে , চোখেতে শ্রাবণ গায় গুনগুন " এরকম আরো কত সোনালী দিনের গান । মনে হত এই বোধ হয় প্যান্ডেল এ দুগ্গা মা এসে গেছেন । মন টা অজানা এক আনন্দে ভরে উঠত।।

পুজোর বেশ আগে থেকেই কোথায় কি থিম এর মণ্ডপ হচ্ছে তা জানার এক প্রবল ইচ্ছা জাগত। স্কুলে যাওয়া আসার পথে এক এক জায়গায় বাঁশ পোতা হচ্ছে অর্থাৎ মণ্ডপ তৈরির কাজ শুরু হয়ে গেছে দেখে খুশির সীমা থাকত না। কার কটা জামা কাপড় হল সে নিয়ে কৌতুহল এর অন্ত ছিল না।

কোন কোন দিন কোথায় কোথায় প্রতিমা দর্শন করব তার ও একটা পরিকল্পনা করে রাখতাম। কারন একটা মণ্ডপ ও মিস করে যাবে না। ছোটবেলা য় পুজোর সময় টা আমার একটা রীতি ছিল সেটা হল মাসতুতো বোন বা মামাতো ভাই দের সান্নিধ্য পাওয়া। তাই ওদের ডেকে নিতাম আমাদের বাড়িতে । সকাল বিকেল মা এর হাতের সুস্বাদু সব রান্না দিয়ে ভুঁড়ি ভোজ আর বিকেলে ঠাকুর দেখা আর রাতে বাড়ি ফিরে দেদার আড্ডা, তার মধ্যে অলৌকিক আলোচনা ছিল মূল বিষয়। এই ছিল আমাদের সহজ সরল শৈশবের দুর্গা পুজো।

প্রত্যেক বছর নবমীর সকাল থেকে ই মন টা খারাপ হয়ে যেত।
মা এর যাওয়ায় সময় হয়ে এল যে ! মণ্ডপে গিয়ে দেখতাম মা দুগ্গার মুখ টি ও যেন আজ বড্ড ম্লান দেখাচ্ছে।ভাবতাম হয়ত আমাদের দুঃখ টাই মা এর উপর প্রতিফলিত হচ্ছে। দশমীর দিন মা কে বিদায় দেয়ার সময় মনে হত কিছু কিছু "অপেক্ষা" তে হয়ত আনন্দ বেশি ।" মা আসছে " এই ভাবনা তে ই যেন বেশি আনন্দ। তাই মনে মনে "মা আবার এসো" বলে মা কে বিদায় জানাতাম। আবার পরের বছরের জন্য দিন গোনা আরম্ভ হয়ে যেত ।
আজ বড্ড মিস করি সেই নিষ্পাপ ছেলে বেলা।

বর্তমান কালে সেই সারল্য , সেই আন্তরিকতা অকালেই ফিকে হয়ে গেছে। নেই কোন প্রাণ। আছে কেবল ই যান্ত্রিকতা। বহু বছর দেশ থেকে বহু দূরে থেকে এই প্রাণহীন দুর্গোৎসব তাই আর মিস করি না

-ঈশিতা রায়

স্বপ্ন

স্বপ্নরা আসে যায়
রাত্রির পলে পলে
বিরামহীন,অক্লান্ত সৈনিক
একের পর আরেক দলে।

স্বপ্নরা আসে যায়
বৈচিত্র্যময় বেনিয়মে, স্বেচ্ছায়
কখনো স্বর্গ গড়ে দেয়
কখনো পাতালে প্রবেশ করায়।

স্বপ্নরা আছে তাই
জীবনের অসহনীয় পরাজয়
মধুর সুরে বাজে
স্বপ্নরা আছে তাই
জীবনের আলোড়িত জয়গান
উন্মুখতায় সাজে।

স্বপ্নরা আছে তাই
পৃথিবীর শেষ নিশ্বাস
আজও বেঁচে থাকে
স্বপ্নরা আছে তাই
প্রাত্যহিক জীবনগান
কোমল স্বর সাধে।

স্বপ্নরা আছে তাই
কল্পনা কখনো কখনো
বাস্তব সত্যি হয়
স্বপ্নরা আছে তাই
জীবনের কোন হিসেব
কখনো মিলে যায়।!

-জয়শ্রী বসু, মেরিল্যান্ড, USA

ফেলে আসা পথ

শরতের নীল আকাশে আগমনীর বার্তা খুঁজি,
পেঁজা তুলোর মত ভেসে এলো পুজোর মেঘ বুঝি।
আমেজভরা উদাস করা ভর দুপুর বেলায়,
ছোট ছোট টুকরো স্মৃতি অনায়াসে আসে যায়।
মনে পড়ে রবিবারের কাগজ আনন্দবাজারে,
বাটার জুতোর থাকত ছবি আস্ত দুপাতা জুড়ে।
বইতো প্রানে আশার বন্যা অপেক্ষা একটানা,
কখন হবে দোকান থেকে নতুন জামা কেনা।
মেয়েদের কত আসত তখন ফ্যাশন রকমারি,
হলিডে-অন-আইস ফ্রক থেকে বালুচরি শাড়ি।
কোথাও দেখতাম খড় মাটি আর রঙ তুলিটি নিয়ে,
শিল্পি চলেছে প্রতিমা গড়ে তার হাতের যাদু দিয়ে।
আকাশবাণী কলকাতা রেডিওয় মহালয়া শোনা,
বীরেন্দ্রকৃষ্ণের সেই পাঠের সাথে সমবেত বন্দনা।
পাড়ায় পাড়ায় মাইক বাজার ছিলনা অবসান,
বিখ্যাত শিল্পীদের সমস্ত পুজা সংখ্যার গান।
যাইনি ভুলে কালজয়ী কজনের সুর এবং কথা,
হেমন্ত, শ্যামল, মান্না আর আশা, আরতি, লতা।
ঢাক-কাঁসরের মাতানো ছন্দে উঠত নেচে মন,
মহোৎসবের আনন্দে সবাই থাকত সারাক্ষণ।
সপ্তমী থেকে দশমী দুবেলা রঙীন পোশাক পরে,
প্যান্ডেল থেকে প্যান্ডেলে ঠাকুর দেখা ঘুরে ঘুরে।
সেসব দিন হারিয়ে গেছে অতীত জীবনে,
ক্ষণিকের তরে স্মৃতিরা ফিরে আসে বর্তমানে।
স্বদেশ ছেড়ে অনেক দূরে মহাসাগরের পাড়ে,
হয়েছি জড়ো আজ আমরা সুন্দর এই শহরে।
পরকে নিয়েছি আপন করে দিয়েছি খুলে মন,
হাতে হাত ধরে করেছি এখানে পুজোর আয়োজন।
জানি কোনদিন পাবনা ফিরে ফেলে আসা সে পথ,
সকলে মিলে হেসে খেলে কেটে যাবে ভবিষ্যৎ।।

-Poem - Phele Asha Poth by Subhas Chandra Ghosh.
Illustration - Somaditya Das

ফেলে আসা পথ

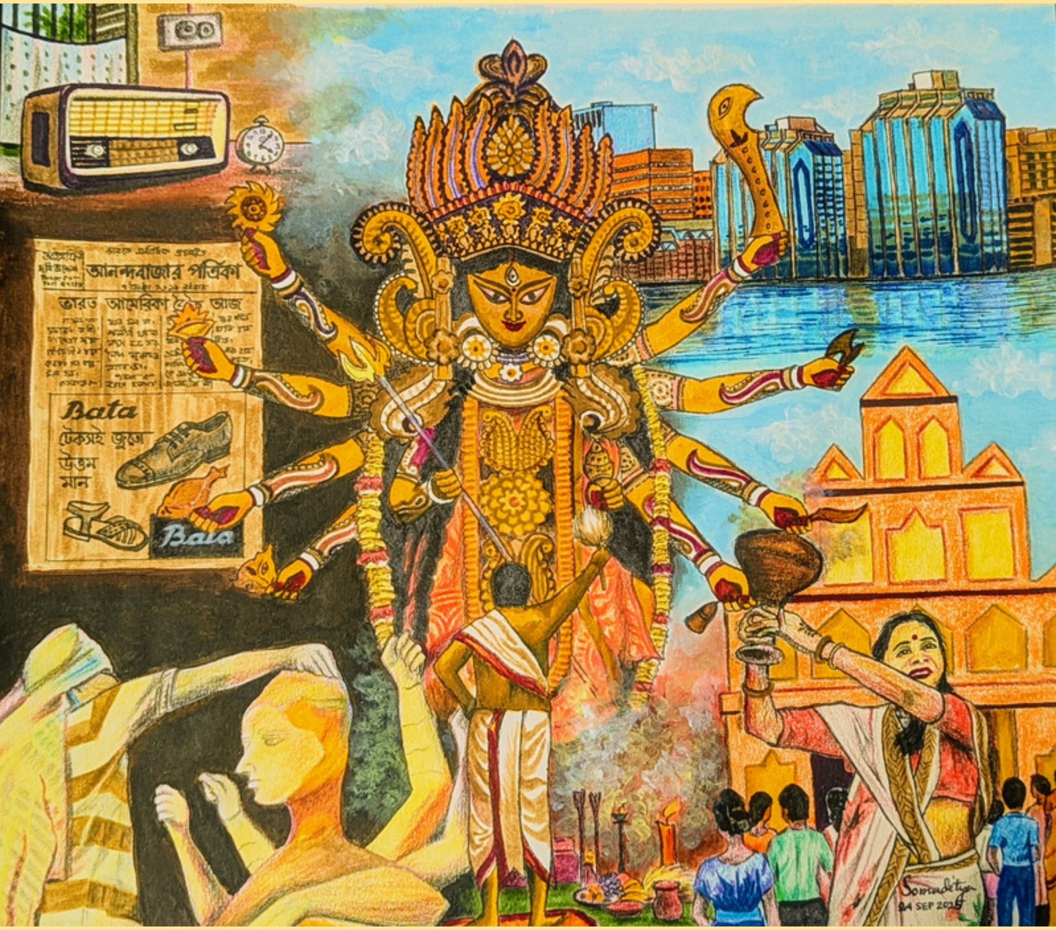

Somaditya Das

Subhas Chandra Ghosh.

পূজোর গন্ধ

“পুজো”, পুজো শব্দটা একটা নস্টালজিয়া বেশিরভাগ যারা মনেপ্রাণে বাঙ্গালি তাদের কাছে। ভোরে উঠে মহালায়া শোনা, শিউলি আর ছাতিম ফুলের গন্ধে আকাশ বাতাস মম, কাশের ঢেউয়ের সাথে ঢাকের বোলের দোল ... আর? বোধনের সময় ঢাকের গুড় গুড়ের সাথে মন আর পেটটা কেমন যেন করে ওঠা। তাই না?

ছোটবেলায় যখন বাবা সরকারি আবাসনে থাকতেন আমাদের নিয়ে তখন বেশিরভাগ সময় বোধন খুব ভোরবেলা হতো। গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন থাকলেও ঠিক ঘুম তা ভেঙ্গে যেত কারন মাঠের মাঝে প্যান্ডেলটায় যে মা নেমে আসতেন শরতের মেঘের সিঁড়ি ভর করে। তখন ঘুমিয়ে থাকলে সারা বছরে ওই একদিন পেটের ভিতরে খুশির হাওয়া নেচে ওঠবার অনুভূতিটা মিস হয়ে যেত, সেটা কি ছাড়া চলে?

ওই খুশির হাওয়ায় ভর করে ষষ্ঠীর দুপুরে পৌঁছে যেতাম মামাবাড়ি। সেখানে থাকত মামাতো ভাই, দিদুন, মামা ও মামি। তারপর শুরু হতো মামার সাথে পুঁজর শপিং। মামা আমাদের দুই ভাই বোনকে নিয়ে যেত এসপ্ল্যানেডে। মফঃস্বলে থাকতাম আমি। তখন এসপ্ল্যানেডের হগস মার্কেট ছিল আমার কাছে এক স্বপ্ন রাজ্য। এত আলো এত দোকান এত জামাকাপড়... চোখ ঝলসে যেতো রঙ্গিন কাপড়ের মায়ায়। অনেক দোকান ঘুরে মামা আর মামি কিনে দিতো পুজোর নাতুন জামা। সেই জামাখানা পেয়ে নিজেকে মনে হতো রাজকুমারী কিম্বা ডানা কাটা পরি!

তখন আমি একটু বড় এই দশ এগারো বছর বয়স, বেশ গোলগাল। নতুন জামাকাপড় পড়লে লোকজনে নানাবিধ ভাবে বুঝিয়ে দিতো যে আমায় আরও রোগা হলে বেশি ভালো লাগত। আমি মোটা, তাই খুব একটা মানায়নি এই জামাটায়। অমন বডি শেমিং-এর মুখে ছাই দিয়ে আমার মনের ভালোলাগার জোয়ার দমায় কার সাধ্যি? বাবা, দুগ্‌গা পুজো বলে কথা, বছরে একবারই আসে, অন্যের তুচ্ছ কথায় কেয়ার করলে চলে? ডানা কাটা পরি না হোক অ্যাটলিস্ট কুছ কুছ হোতা হ্যায়- এর কাজলের মত লাগলেই চলবে!

মামাবাড়ির পারায় একটা খুব ঘরোয়া কিন্তু বারোয়ারি পুজো হোতো। পাড়ার সবাই আমায় টিয়া বা চিনি বলে চিনত। (দুটোই মামার দেওয়া নাম।) তাই বেশি ছুকছুক বা ইতিউতি তাকানো বারন ছিল এবং তা করবার মত সাহসও হয়নি কোনদিন। তাই পুজোটা খুব মজা করে কাটত। ঝারি মারা বা কে ঝারি মারল তার টেনশন ছিলোনা! একেবারে স্বরাষ্ট্রের অঙ্গীকারের মতো, "ভারত আমার দেশ, সকল ভারতবাসী আমার ভাই ও বোন... " !

আমার টার্গেট থাকত প্রথম সারির একটা চেয়ার। সেটা না পেলে মনটা খুব ভার হয়ে থাকত। চেয়ারে বসে বহুক্ষণ মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতাম আর প্রাণ ভোরে পুজোর গন্ধ নিতাম। সপ্তমীতে মা এর মুখ কেমন উজ্জ্বল থাকত আর মণ্ডপে একটা ফুল ফল আর মিষ্টির গন্ধ থাকত। অষ্টমিতে থাকত বেলপাতা ধুনো আর ফুলের গন্ধ সাথে মায়ের মুখে থাকত একটা তেজদীপ্ত আভা। নাবমিতে থাকত যজ্ঞে পোড়া বেলকাঠ ধুনো আর বাসি ফুলের গন্ধ আর মায়ের মুখটা কেমন যেন কাঁদ-কাঁদ হয়ে যেত। আর দশমীতে আমার মনটা এত খারাপ থাকত তাই হয়ত মায়ের চোখটাও ছলছল করে উঠত। দশমীর সকালে আমি কোনদিন যেতামনা মণ্ডপে। একেবারে ঠাকুর বরনের সময় মা ও মামির সাথে বরনের থালা হাতে দাঁড়াতাম গিয়ে। যতো ঢাকের বোল তালে তালে গাইত "ঠাকুর থাকবি কতক্ষণ ঠাকুর যাবি বিসর্জন" তত মনটা একটা গভীর দুঃখে দুলে দুলে উঠত। আমার মা আর মামির ঠাকুর বরনের পালা যখন আসত তখন দুগ্‌গা মায়ের মুখটার দিকে আমি তাকাতে পারতাম না। সবাই একমনে মায়ের বরন করতো আর আমার মন তখন বাঁশ বনে হাওয়া লাগলে যেমন হুহু শব্দ হয় তেমনই হু হু রবে কাঁদছে। এবারে ভাসবার দিন শেষ পড়াশোনার দিন শুরু।

মা সরস্বতীকে বরন করবার সময় দেখতাম সব ছেলেমেয়েরা কি ভক্তি ভরে প্রণাম করছে তাঁকে। আমি আমার মুখটা ওনাকে দেখাতে পারতামনা, কারন জানতাম কিছু চাইবার মতো মুখ রাখিনি আমি! পাছে কিছু চাইতে গিয়ে উল্টে আভিশাপ পেয়ে গেলেই কেস! তাই একটা ছোট্ট করে প্রণাম করেই দে ছুট! মা দুগ্‌গার সাথে আমি তখন মনে মনে খুব কষ্টে আছি। এদিকে মামাবাড়িতে তৈরি হয়েছে পায়েস, আর ঘুগনি। কোনোটাই খুব একটা পছন্দের না। মামাবাড়ির লিভিং রুমে জড় হয়েছে সবাই। এমনকি ছোট মামা, ভালো মামাও। সবাই ভীষণ গল্পে ব্যাস্ত। ভাইটা মণ্ডপে বন্দুক নিয়ে চাপ ফাটিয়ে চলেছে বন্ধুদের সাথে, আর আমি দিদুনের ঘরে বসে আপন মনে গুমরে

চলেছি। হঠাৎ শুনতে পেলাম মাইকে অ্যানাউন্স হচ্ছে ঠাকুর এবার বিসর্জন হবে। বাবা, আমি, মামি চলে যেতাম পুকুর পাড়ে ভাসান দেখতে। সে ভাসানের কি ধুম! কেউ রাস্তায় শুয়ে পরে নাচছে, কেউ কোমর দুলিয়ে নাচছে, কেউ ঘাড়ে উঠে নাচছে কেউবা নাচছে যে সেটা বোঝবার অবস্থায় নেই! আমি জানতাম মা দুর্গা হলেন বাড়ির মেয়ে। তা বাড়ির মেয়ে চলে গেলে যে এত আনন্দ হয় তা পাড়ার দাদা ও কাকুদের দেখলে বোঝা যায়! ঢাকিদের হাতে বারতা বাজলে কোনও এক দয়ালু পুরুষের খেয়াল হোতো যে ভাসান দিতে রাত হয়ে যাচ্ছে, তখন ধুম পরত ঠাকুরকে বিসর্জন দেওয়ার। সবাই ঠাকুরকে দশ পাক ঘুরিয়ে হাত থেকে সবকটি অস্ত্র বাচ্চাদের মধ্যে বিতরণ করে (জানিনা কেন?) অবশেষে মাকে কৈলাসেরদীকে রওনা করানো হতো। কোনদিন একটি অস্ত্রও আমার জুটতোনা। বড় দুঃখ হতো। ভাই পেতো কিন্তু আমায় দিতনা। মাকে নালিশ করতে গেলে আমল পেতনা ব্যাপারটা। পরে বুঝেছিলাম যে আমার অস্ত্রের দরকার নেই আমার মেজাজ খানাই মোক্ষম তাই টিনের তলওয়াড়ের দরকার আমার ছিলোনা কোনদিনই।

এখনো পুজো হয়। এখনো পাড়ায় পাড়ায় মা আসেন কিন্তু না আছে মামা, না রইল মামাবাড়ি। সব কেমন যেন স্বপ্নের মতো মিলিয়ে গেল হঠাৎ। বিয়ের পর চলে আসলাম ভিন দেশে। সেখানে পুজো হয় ঠিকই কিন্তু সেখানে আমার সেই মা নেই যিনি পাঁচদিন আমার সাথে তার রূপ গন্ধ আর অনুভুতি গুলো ভাগ করে নেন সবার সাথে সমান ভাবে। সেই পাড়াটা নেই যেখানে সবাই সবাইকে চিনত, ভালবাসত। সেই নিষ্কলুষ সকাল বিকেল রাত নেই যেখানে কথা বলার আগে দাঁড়িপাল্লায় নিজের ধন সম্পত্তি মাপতে হয়না। আছে শুধু গাড়ি শাড়ী গয়না আর কোলাহল। মন্ত্র নেই মাতব্বর আছে, ধুপ ধুনো নেই ঈর্ষা আছে, ভক্তি নেই অর্থের শক্তি আছে।সবটাই ফাঁকা সবটাই মেকি।

তবু পুজো এলে মনটা কেমন হাল্কা হয়ে যায় আকাশের গায়ে লেগে থাকা সাদা সাদা মেঘ গুলোর মতো। পালকের মতো উড়ে যায় সেই ছোটবেলার স্মৃতির গাদার উপর। যেখানে মামার আদর ছিল, দিদুনের গায়ের গন্ধ ছিল, ভাইয়ের সাথে খুনসুটি আর খেলা ছিল, মন ভরা সারল্য আর ছিল একমুঠো রোদ ঝলমলে অনাবিল আনন্দ।
এখন “পুজো” শব্দটা একটা ঘুণ ধরা জাতির আনন্দের স্কেলিটন আর আমার মতো কিছু "না ঘর কা, না ঘাট কা"-র নস্টালজিয়া।

শায়নী রাউত
ফিনিক্স, অ্যারিজোনা।

পটকা ও ফটকা

- শঙ্কর লাল সাহা

পটকা বলে বিছানায় আলস্যে শুয়ে শুয়ে,
আছি ভাল উঠব না, ওযে বড্ড একগুঁয়ে,
সব কাজেতেই অলস ভীষণ ফাঁকিবাজ,
পেটে গামছা বেঁধে থাকবে তবু করবে না কাজ ।

কাজ করতে বললেই ঘোরায় সকাল সাঁঝে,
কথা বলার ধরনটাও বড্ড বেশি বাজে,
ডানে বললে বামে যায় সামনে বললে পিছনে,
সাত সেয়ানার এক সেয়ানা শয়তানি মনেমনে ।

যেন কিছুই বোঝে না কিছুতেই নয় সোজা,
যেখানে যায় সেখানেই হয়ে থাকে বোঝা,
চলনে ফিরনে নিজেকে বানায় হাবাগোবা,
পুকুর ছেড়ে স্নান করে ঐ আছে এদোঁড়োবা ।

আসলে সে নয় তো বোকা ওযে বোকা সেয়ানা,
কাজের বিষয়ে বললে তখন শুধু দেয় বাহানা,
খিদে পেলে গোঁসা হয়ে ফটকাকে বলে আন লুটেপুটে,
খাবার আনলে খেয়ে নেয় দুজনেই হাত চেটেপুটে ।

পটকা কিছু দরকারে ইশারায় করে অঙ্গভঙ্গি,
অমনি বুঝে যায় ফটকা ওযে জুড়িদার সঙ্গী,
রোজরোজ খিদের জ্বালায় বেরিয়েছে কাজের খোঁজে,
চটকা ওদের দিয়েছে কাজ কিন্তু কাজের কি বোঝে !!

যোগাড় করেছে ঠিকাদারি কাজ শেষে বন দফতরে,
একদিন ধরবে দুষ্টু বাঘ খাঁচার ফাঁদ পেতেছে বড়াই করে,
দক্ষিণরায়ের গর্জনে ভয়ে ওরা ছুটে প্রাণ বাঁচায়,
জাঁতাকলে ঢুকে নিজেরাই আটকায় খাঁচায় ।।

মুঠোফোন

-তনুকা ভৌমিক

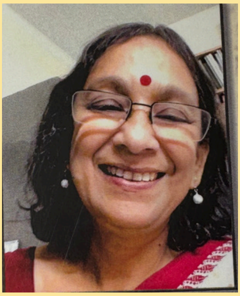

হাতে ফোন। , কানে ফোন
সবে বলে “শোন্ শোন্”
কত কি যে ঘটে যায়
এ বিরাট দুনিয়ায়!

কত ছবি রঙচঙে
কত লোক নানা ঢঙে
এসে কথা বলে যায়
মুঠোফোনে পর্দায় ...।
গান শুনি, ঝগড়াও
খেলা চাই? পাবে তাও।

আজব এ দুনিয়ার
খোলা যে প্রবেশদ্বার
টুপ্ করে ঢুকে যাও
যত মজা লুটে নাও।

ঘাড় হেঁট , মাথা নিচু
দেখে না তো কোন কিছু
মুঠোফোনে চোখ খালি
বাকি সব মারো গোলি !

তাই আজ চোখে আসে
মেট্রো কি ট্রামে - বাসে
পাশাপাশি বসে থাকা
প্রতিটি মানুষ একা
নিজের জগতে ঘোরে
মুঠোফোন হাতে করে।

ঘাটশিলা ভ্রমণ
যেন এক তীর্থ দর্শন

ঘাটশিলা তার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের জন্য বিখ্যাত। ঝাড়খণ্ডের এই বিশিষ্ট পর্যটন কেন্দ্র পশ্চিমবঙ্গবাসির খুব কাছের ও পছন্দের বেড়ানোর জায়গা কারণ এখানকার স্বাস্থ্যকর জল-হাওয়া ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য। ঝাড়খণ্ডের পূর্ব সিংভূম জেলার বনাঞ্চলের মধ্যে সুবর্ণরেখা নদীর তীরে এই ছোট শহরটি অবস্থিত। এখানে দেখার জায়গাগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ফুলডুংরি, বুরুডি লেক, ধারাগিরি ফলস। আর আছে সাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দোপাধ্যায়ের বসতবাটি 'গৌরীকু'।

ইতিহাস পর্যালোচনায় জানা যায় মধ্যযুগে বাঙ্গালি সম্প্রদায় ঘাটশিলা শাসন করত। পরে ধলভূম রাজবংশ শাসন ক্ষমতা দখল করে। এখানকার সংস্কৃতি বিশ্বজনীন, বাঙ্গালী, বিহারী, গুজরাটি, মারোয়ারী, পাঞ্জাবী ও অন্যান্য সম্প্রদায় একসাথে বসবাস করে। ধর্মনিরপেক্ষ সংস্কৃতি এখানে গড়ে উঠেছে। এখানকার বহু মানুষই বাংলাভাষী। ঘাটশিলা স্বাস্থ্যকর জায়গা এবং এই কারণে অতীতে অনেক সম্পন্ন বাঙ্গালি বাড়ী করেছেন অবকাশ যাপনের উদ্দেশ্যে।

ঘাটশিলার একদিকে পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া ও ঝাড়গ্রামের সীমানা অন্যদিকে উড়িষ্যার ময়ূরভঞ্জ। এখানে এলেই মনে পড়ে পথের গান 'পথের পাঁচালির কথা এখানে বসেই বিভূতিভূষণ বন্দোপাধ্যায় লিখে গেছেন একের পর এক উপন্যাস, যথা - অপরাজিত, আরণ্যক, চাঁদের পাহাড়। আজ থেকে ৭৫ বছর আগে ১৯৫০ সালে মাত্র ৫০ বছর বয়সে তিনি দেহত্যাগ করেন। এই শহর ভীষণভাবে তাঁকে মনে রেখেছে। দহিগোড়ায় তাঁর বাড়ী গৌরীকুঞ্জ আমরা দেখলাম। গৌরীকুঞ্জে যাবার পথটি অপুর পথ নামে পরিচিত। বাড়ীটি খুব সুন্দর ভাবে রক্ষিত। তাঁর ব্যবহার করা প্রতিটি জিনিষ অতি যত্নের সাথে রাখা। বাড়ীর চতুরে বিভূতিভূষণের জীবনের বিভিন্ন ঘটনাকে চিত্রের সাহায্যে তুলে ধরা হয়েছে। ঘরে সুন্দর ভাবে সংরক্ষিত তাঁর পোষাক, আলোকচিত্র, গ্রন্থতালিকা ও চিত্রপট। দেখে মন ভরে ওঠে। মনে হল এ যেন বাংলাভাষীদের কাছে এক তীর্থস্থান। গৌরীকুঞ্জ উন্নয়ন সমিতি বাড়ীটি

দেখাশুনা করে। শুধু তাই নয় 'অপুর পাঠশালা' নামে একটি বাংলা মাধ্যম পাঠশালা চালায় এই সমিতি এই বাড়ীতেই। প্রতি রবিবার এই পাঠশালা বসে। বাংলা ভাষাকে বাঁচিয়ে রাখার এই প্রয়াস দেখে আমরা যেমন মুগ্ধ হয়েছি তেমনি মনের মধ্যে এক গভীর প্রশান্তি অনুভব করেছি।

ঘাটশিলা শহর সাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দোপাধ্যায়কে যথাযথ মর্যাদায় মনে রেখেছে। এখানকার অনেক হোটেলের নামকরণে তিনি উপস্থিত। ঝাড়খণ্ড পর্যটন বিভাগের হোটেলটির নাম বিভূতি বিহার। আশেপাশের দর্শনীয় স্থানেরও একই ভাবে নাম দেওয়া হয়েছে। এমনকি রেস্টুরেন্টের পদের নামকরণেও তিনি উপস্থিত। সাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দোপাধ্যায় এখানে সর্বোতোভাবে পুজ্য। প্রতি বছর সেপ্টেম্বর মাসের ১২ তারিখ ওনার জন্মদিনে ঘাটশিলায় সাংস্কৃতিক উৎসব হয়। এভাবেই সাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দোপাধ্যায় এখানে বর্তমান।

বিভূতিভূষণ বন্দোপাধ্যায়ের সমস্ত লেখায় বন ও প্রকৃতির সঙ্গে তাঁর নিবিড় সখ্যতা প্রকাশ পেয়েছে। বন ও প্রকৃতি দেখলে তিনি আনন্দে উদ্বেল হয়ে উঠতেন। ঘাটশিলার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য তাঁর লেখার মধ্যে সুন্দরভাবে বর্নিত হয়েছে। তাঁর বাড়ী গৌরীকুঞ্জ তিনি ১৯৩৯ সালে কিনেছিলেন। এ বাড়ী কেনারও ইতিহাস আছে। বাড়ীটি আগে ছিল বিলেত ফেরত অশোক গুপ্ত মহাশয়ের। তিনি লেখক বিভূতিভূষণ বন্দোপাধ্যায়ের কাছে পাঁচশত টাকা ধার নেন। সেই ধার শোধ করতে না পেরে লেখকের আপত্তি অগ্রাহ্য করে তিনি বাড়ীটি লেখককে লিখে দেন। সেই সময় এই বাড়ীর উঠোন হতে সুবর্ণরেখা নদী ও পাহাড় জঙ্গল দেখা যেত। বিভূতিভূষণের পরে আরও কয়েকজন বাঙ্গালি সাহিত্যিক ঘাটশিলায় এসে বসবাস শুরু করেছিলেন। এনারা হলেন : সাহিত্য একাদেমি পুরস্কার প্রাপ্ত গজেন্দ্র কুমার মিত্র (১৯০৮ - ১৯৪১), সাহিত্যিক প্রমথনাথ বিশি (১৯০১- ১৯৮৫) এবং সাহিত্যিক সুবোধ ঘোষ (১৯০৯ - ১৯৮০)। বিভূতিভূষণ ছাড়া সকলেই ঘাটশিলা থেকে ফিরে আসেন। ঘাঠশিলায় দেখার মতো আর যে জায়গাগুলি আছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল লেখকের অত্যন্ত প্রিয় জায়গা অন্যতম দর্শনীয় স্থান ফুলডুংরি। এই নির্জন স্থানে পাহাড় ও বনানীর শোভা দেখার মতো। কিন্তু

১৮ নম্বর জাতীয় সড়কের কারণে নির্জনতা উপভোগ এখন আর করা যায়না। দেখার মতো একটি লেক আছে এখানে নাম বুরুডি লেক। ধান ক্ষেতের মধ্যে দিয়ে রাস্তা পেড়িয়ে যেতে হয়। ফুলডুংরি থেকে প্রায় ১৪ কিলোমিটার দূরে তিন দিক পাহাড় ঘেরা মনোরম জলাশয়। এছাড়া আছে ধারাগিরি কলস। দূরত্ব ৮ কিলোমিটার। কিন্তু ফলস দেখতে হলে অনেকটা আগে গাড়ী রেখে
১ কিলোমিটার রাস্তা হেঁটে যেতে হয়।

-ড: সুব্রত মণ্ডল

BAAC Durga Puja, October 3rd-5th 2025

॥ নারী দিবস ।।

- বিশ্বদেশ চক্রবর্তী

নারী, তুমি যখন মাতা
তখন তুমি নিঃস্বার্থ স্নেহের খনি।
তোমাকে বকা যায় -
আবার বকুনি খাওয়াও যায়।
যত কিছু মান অভিমান রাগ
তোমার ওপর অক্লেশে ছুড়ে দেওয়া যায়।
কারণ, জানি তোমার অকৃত্রিম ভালোবাসা
কখনো ফুরিয়ে যাবার নয়।
তোমাকে জড়িয়ে ধরেই তো আমরা-
দূর্বল লতার মতো উপরে উঠি।।

তুমি যখন সহোদরা,
এক অকৃত্রিম ভালোবাসার বন্ধনে
অন্তরের ভিতরটা সংপৃক্ত থাকে।
যত দূরেই থাকো না কেন -
হৃদয়ের মর্মস্থলে নৈকট্যের এক
গভীরতা উপলব্ধি হয়।।

তুমি যখন বন্ধু -
তখন তো মনের জানালা
হাট করে খুলে যায়।
দীর্ঘ সময়ের বিচ্ছেদেও -
অমলিন থাকে অনুভূতির ছন্দগুলো।।

যখন তুমি প্রেয়সী সাথী,
তখন তুমি ভরসার এক তরণী।
সাংসারিক বন্ধনের দৃঢ় গ্রন্থিটা
তুমিই তো বহন করো।
পৃথিবীর সব শূণ্যতাকে -
এক নিমেষে ভরিয়ে দেবার
অদ্ভুত শক্তি তোমার হাতে।
শুধু একটা দিনতো তোমাদের নয়,
প্রতিদিন প্রতিক্ষণ তুমি আছো তোমরা আছো।

নিবারণের ভূত

ভূতেদের নিয়ে বেশি ঠাট্টা ইয়ার্কি করা ঠিক নয়। বিশেষ করে যখন মানুষের উৎপাতে গাছপালা, পোড়ো বাড়ি সব কমে যাচ্ছে, ভুসুন্ডির সেইরকম মাঠও নেই, আর একটা গা ছমছমে ভাব ও নেই, এই অবস্থায় স্থানাভাবে এমনিতেই ভূতেদের মন মেজাজ বেশ খিঁচড়ে আছে, তার ওপর ছেলেছোকরার দল যেখানে সেখানে বাইক অ্যাকসিডেন্ট করে অপঘাতে মৃত্যু ঘটিয়ে আবার ভূত হয়ে ফিরে আসছে। এই নতুন নতুন ভূতেদের সংখ্যাধিক্যের কারণে পুরোনো ভূতেদের প্রাণ ওষ্ঠাগত। মেয়েরাও কিছু কম যায়না, তারাও প্রেম ঘটিত কারণে যখন তখন গলায় দড়ি অথবা বিষ খেয়ে অপঘাতে মরে পেত্নী বা শাকচুন্নি হয়ে ভিড় বাড়াচ্ছে।

আজকের বিষয়টা যাকে নিয়ে সে হলো নিবারন।

নিবারন হালদার। তার নির্দিষ্ট কোনো পেশা ছিল না। কখনো কাঠমিস্ত্রীর হেল্পার, কখনো বা রাজমিস্ত্রীর জোগাড়ে, আবার কখনো বা ইলেকট্রিক মিস্ত্রীর মাল বওয়ার কাজ। মোটামুটি সব ঠিকঠাকই চলছিল। ঘরে একটা লক্ষ্মীমন্ত বউ ও ছিল। বাদ সাধলো লকডাউন। কাজকর্ম সব বন্ধ হয়ে যাওয়াতে পেটে টান পড়লো। সামান্য পুঁজি শেষ হতে শুরু করলো। গঞ্জের ব্যবসায়ী রাম রতন পোদ্দার এর কাছে ধার বাড়তে লাগলো। তিনি আবার আড়ালে আবডালে সুদের করবার ও করেন। গঞ্জের ধারে দু কাঠা জমিই তখন সম্বল। রামরতন একদিন ডেকে স্নেহের সুরে বললেন '" শোন নিবারণ, তোর তো অনেক ধার হলো, সুদে আসলে সে অনেক টাকার ব্যাপার। তুই একটা কাজ কর, তোকে আরো পাঁচ হাজার টাকা দিচ্ছি, তুই তোর দুকাঠা জমিটা লিখে দে।"

কথা টা শুনে নিবারণের মাথা ঘুরে উঠলো। এক গ্লাস জল খেয়ে সে বললো,"বাবু, ওটাই তো আমার শেষ সম্বল, আমি বউ এর সঙ্গে কথা না বলে তো আপনাকে কথা দিতে পারছিনে।"

"ঠিক আছে, সাত দিন সময় নে, কথা বল তারপরে জানাবি।"

ঘরে এসে বউকে ব্যাপারটা বলতেই বউ কেঁদে ভাসালো। কিন্তু পেটের জ্বালা বড় জ্বালা। ঘরে হাঁড়ি চড়ছে না। এই অবস্থায় পাঁচ হাজার টাকা অনেক। সুতরাং যা হওয়ার তাই হলো। সাতদিনের মধ্যে জমিটা রামরতন পোদ্দারের হস্তগত হলো। সেই টাকায় কষ্টেসৃষ্টে কিছুদিন চললো।

তাও এ পর্য্যন্ত ঠিক চলছিল। এরপরে বিপদ এলো সম্পূর্ণ অন্যদিক থেকে। নিবারণের বউ রাম রতনের কুনজরে পড়লো। নিবারণের বউকে রাম রতন নানা অছিলায় বাড়িতে ডেকে পাঠাতে লাগলো। কিছুদিনের মধ্যেই ব্যাপারটা জানাজানি হলো। পাড়ায় পাড়ায় ঢি ঢি পড়ে গেলো। পাড়ার মাতব্বররা পরের শনিবার সালিশি সভার আয়োজন করল। রামরতন শুক্রবার রাতে চুপিচুপি মাতব্বরদের মোটা টাকা ঘুষ দিয়ে এলো।

শনিবার দিন সালিশি সভায় যথারীতি নিবারণের বৌকেই চরিত্রহীন বলে দোষী সাব্যস্ত করা হলো। কয়েক ঘণ্টাও কাটলো না। ভর সন্ধ্যেবেলায় লজ্জায়, দুঃখে, অপমানে নিবারণের বউ গলায় দড়ি দিলো।

বাড়ি ফিরে নিবারণ এই দৃশ্য দেখে ঘন ঘন মূর্ছা যেতে লাগলো। তার তিন কুলে ওই একটাই বন্ধু ছিল। তারপরে যখন একটু ধাতস্থ হলো রাম রতনের প্রতি ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠলো। কিন্তু গরীবের অক্ষম রাগ। তাও একটা কাটারি নিয়ে বেরিয়ে পড়লো রামরতনকে খুন করবে বলে। পাড়ার লোকজন কোনো রকমে তাকে নিরস্ত করলো।

দু দিনের মধ্যে নিবারণ প্রবল জ্বরে পড়লো। তিনদিনের দিন প্রলাপ বকতে শুরু করলো। প্রথম দু দিন পাড়া প্রতিবেশীরা দেখভাল করছিল, তারপরে তারাও পিছটান দিলো। চারদিনের দিন সকাল থেকেই দুটো যমদূত ঘোরাঘুরি করতে লাগলো। বিকেল বেলায় হঠাৎ তার মনে একটা দারুন প্রশান্তি এলো। তার আত্মাটা শরীর থেকে বেরিয়ে কিছুক্ষণ নিবারণের নশ্বর দেহটার দিকে প্রবল বিতৃষ্ণার দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলো। ভাবলো এই অপদার্থটার ভেতরে সে এত বছর কাটিয়েছে! তারপরেই সে হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। গিয়ে বসলো রামরতনের বাড়ির ঠিক পেছনের বেলগাছে।

মাথার মধ্যে নিবারণের, থুড়ি নিবারণের ভূতের সব সময় আগুন জ্বলছে।

সে এখন অন্য মানুষ মানে ভূত। রাত ন'টার দিকে দেখলো তার দেহটাকে বেশ কিছু লোকজন বাঁশের খাঁচায় চাপিয়ে বলো হরি হরি বোল করতে করতে পাশের রাস্তা দিয়ে শ্বশানের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। ভাবলো যাক আপদ গ্যাছে। আবার একটু দুঃখও হলো, মানুষটা বড়ো ভালো ছিল। তার দেহ দৃষ্টির বাইরে যেতেই আবার রামরতনকে শায়েস্তা করার ফন্দি আঁটতে লাগলো। ইতিমধ্যে তার বেশ খিদে পেলো। যেগুলো সে বেঁচে থাকতে খেতে ভালো বাসতো যেমন মিষ্টি, দই ইত্যাদি সেগুলো ভাবলেই বমি উঠে আসছে। সে সবিস্ময়ে লক্ষ্য করলো যে তার এখন ভালো লাগছে শুঁটকিমাছ, তেতুঁল, নুন, লঙ্কা, আচার ইত্যাদি। আর একটু রাত বাড়তেই লক্ষ্য করলো যে আশেপাশের ছোট বড় সব গাছ গুলোতে নানা রকমের ভূত, পেত্নী, শাকচুন্নিরা যার যার জায়গায় এসে বসছে। তাদের প্রবল চেঁচামেচিতে কান পাতা দায়। একটা মামদো ভূত তার কাছে এসে খ্যাঁক খ্যাঁক করে বললো " কি রেঁ তুঁ কবে পটল তুললি ?"
"এঁই বিকাঁলে।"
"মরলি ক্যানে?"
" জ্বর হইছিল।"
"ও আঁচ্ছা।"

এই বলে মামদো যেমন ধাঁ করে এসছিল সেরকমই সাঁ করে মিলিয়ে গেলো। কিছুক্ষণ পরে একটু শুটকি মাছ, তেতুঁল, টক চাটনি, একটা শুকনো লঙ্কা, দুটো লেবু আর একটা কৎ বেল নিয়ে এসে বললো " নে কাঁ।"
বহুদিন পরে নিবারণের ভূত বেশ তৃপ্তি করে খেয়ে একটা ঢেঁকুর তুললো। তারপর আবার রাম রতনকে শায়েস্তা করার চিন্তায় ডুবে গেলো। একবার ভাবলো ও তো ইচ্ছে করলেই জানলা দিয়ে লম্বা হাত ঢুকিয়ে ওকে গলা টিপে মেরে ফেলতে পারে। পরক্ষণেই ভাবলো তাহলে তো ও ব্যাটা খুব সহজেই ছাড়া পেয়ে যাবে, তার থেকে ওকে ভয় পাইয়ে পাইয়ে মারতে হবে এমনটাই সাব্যস্ত করলো।

রাত এগারোটার দিকে একটা বড়সড় বেম্বদত্যি বেলগাছটার মগডালে এসে বসলো।
"এঁই তুই কেঁডা?"
"আঁজ্ঞে আঁমি নিবারণ।" ভয়ে ভয়ে বলল।"
"তোর কি হইল?"

"আঁজ্ঞে চাঁর দিনের জ্বরে মরসি।"
"বাঁচছস্"
কথা আর বেশি এগোলো না।

এদিকে রাম রতনও স্বস্তিতে নেই। তার খালি মনে হচ্ছে তার বাড়ির পেছনে কিছু একটা পরিবর্তন হয়েছে। বাড়ির পেছনের বেলগাছের দিকে তাকালেই কেন যেন গা টা ছমছম করে। এখন সে সন্ধ্যে হওয়ার আগেই বাড়িতে ঢুকে পড়ে। মনের মধ্যে সবসময় একটা ভয় ভয় ভাব। দিন তিনেক পরে তার ভয় ভাবটা একটু কেটে গেলো। সন্ধ্যের ঠিক আগে আগে বাড়ির পেছনে বেলগাছটার কাছে একটু ছোটবাইরে করতে গেলো, আর ঠিক সেই সময়েই ঝুপ করে সন্ধ্যে নামলো।

নিবারণ ও তক্কে তক্কে ছিলো। এক ঝটকায় রাম রতন কে তুলে নিয়ে বেলগাছটার গোড়ায় আছাড় দিয়ে ফেললো। রাম রতন ঘটনার আকস্মিকতায় প্রথমে ঘাবড়ে গেলো। পরক্ষণেই মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো " কে রে শ্লা#@..।"

"শাঁলা তুঁর যম।" বলে খ্যাঁক খ্যাঁক করে নিবারণ হেসে উঠলো।
রাম রতন এবার এক ফালি চাঁদের আলোয় পস্টো দেখতে পেলো ওর সামনে কালিঝুলি মাখা তাল ঢ্যাঙা নিবারণ দাড়িয়ে।

" নি - নি - বারন ... তু.. তু.. মরিস নি? মা.. মানে আপনি.... ভূ.. ভূ.."
কথাটা শেষ হলো না। তার আগেই রাম রতনের গলাটা সিড়িঙ্গে বাঁ হাত দিয়ে সাড়াসির মতো ধরে শুন্যে তুলে ডান হাত দিয়ে একটা বিরাশিসিক্কার চড় কষালো। রাম রতন টাল খেয়ে পড়তে পড়তে দেখলো আশে পাশে অনেক ভূত পেত্নী শাকচুন্নির দল মাথা ঝুঁকিয়ে তাকে দেখছে, খ্যাঁ খ্যাঁ করে হাসছে আর বলছে "বেঁশ হয়েচেঁ..বেঁশ হয়েচেঁ।"

রামরতন ছোটবেলা থেকেই শুনে আসছে যে ভূতে ধরলে বার বার রাম নাম জপতে হয়। কিন্তু এই দুর্যোগের সময় কিছুতেই তার নামের প্রথম দু অক্ষর মনে এলো না। এমনকি বাবার নাম যে শ্যাম রতন সেটাও মনে এলো না। কেবলই ঠাকুর্দার নাম নাড়ু গোপাল পোদ্দার মাথার মধ্যে বিজ বিজ করতে লাগলো। রামরতন পাপীতাপী মানুষ, তাই জান খুব কড়া। অন্য কেউ হলে

এতক্ষণ দাঁত কপাটি লেগে অজ্ঞান হয়ে যেত। কিন্তু এটা রাম রতন। কিছুক্ষণের মধ্যেই সম্বিৎ ফিরলো। নিজের নাম মনে পড়লো। আর নিজের নামের আগে জয় লাগিয়ে ' জয়রাম জয়রাম ' বলে বন বাদাড় ভেঙ্গে দাসেদের পুকুরের পাশ দিয়ে দৌড় লাগিয়ে চওড়া রাস্তায় উঠলো।

কখন নিজের অজান্তেই জয়রাম টা জয় শ্রী রাম হয়ে গ্যাছে সে খেয়াল করেনি। 'জয় শ্রী রাম' বলতে বলতেই দৌড়ে মোড়ের মাথায় ঘোষ মিষ্টান্ন ভান্ডারের সামনে পৌঁছাল। ওখানে তখনও কিছু লোকের আনাগোনা চলছে। তার মধ্যে বাইক দাঁড় করিয়ে তিনটে ছেলে জটলা করছিলো। তারা বোধহয় শাসক দলের হবে। রামরতনের মুখে জয় শ্রীরাম শুনে তাকে বেধড়ক ক্যালালো। রামরতন দশ মিনিটের মধ্যে দুবার মার খেলো। একবার ভূতের হাতে আর একবার চ্যাংড়া ছেলেছোকরা দের হাতে।

আজ রামরতনের বাড়িতে বিরাট হোমযজ্ঞের আসর বসেছে। নদীয়া থেকে বিখ্যাত সন্ধ্যারানীর কীর্তনের দল এসেছে। ভূত তাড়ানোর বিশেষজ্ঞ হিসেবে বিশু ওঝা তার সঙ্গে তিনটে পালোয়ান শাগরেদ নিয়ে এসেছে। ছাদ আর উঠোন মিলিয়ে বিরাট ম্যারাপ বাঁধা হয়েছে। বাড়িতে বাচ্চাকাচ্ছা, পাড়া প্রতিবেশী, আত্মীয় স্বজন, অনাত্মীয় সব গিজ গিজ করছে। উঠোনের একপাশে ভিয়েন বসেছে। দুটো প্রকান্ড উনুনে গনগন করে আগুন জ্বলছে আর নানা পদের রান্না হচ্ছে। উঠোনের আর এক পাশে কিছু দেহাতি মহিলাকে ভাড়া করে আনা হয়েছে রাম গান করার জন্যে। সঙ্গে দুজন পুরুষ ঢোল বাদক। একটু পরে কপাক কপাক করে ঢোল বেজে উঠলো। আর দেহাতি মহিলার দল গান ধরলো

রঘুপতি রাঘব রাজা রাম
পতিত পাবন সীতা রাম।।

সব ভূত, পেত্নী, শাকচুন্নির দল বিভিন্ন গাছ থেকে উঁকিঝুঁকি মারছে আর মজা দেখছে। আধুনিক ভূতেরা আর রাম নামে ভয় পায় না। এর মধ্যেও নিবারণ কান করে শুনলো এক রোগা কালো মতো মহিলা কিনকিনে গলায় যখনই ' পতিত পাবন ' কথাটা বলা হচ্ছে তখনই ' লালুয়া কা বাবা ' বলছে। নিবারণ বুঝলো যে যেহেতু পতিত পাবন লালুয়ার বাবা অর্থাৎ তার স্বামী এবং অনেক হিন্দু মেয়েরা স্বামীর নাম নেয় না সেই কারণেই সে এটা

বলছে। আরো বুঝলো এই দেখে যে পাশেই তেঁতুলের দলার মতো ছোট্ট লালুয়া বসে আছে।

এর মধ্যে রামরতন হিসেব করে দেখলো তার এই কদিনে সব যোগাড়যন্ত্র করতে সাতানব্বই হাজার সাতশো আটানব্বই টাকা খরচ হয়েছে। তাও এখনও আসল কাজ শুরু হয়নি। এক একবার কয়েক হাজার টাকা করে খরচ হচ্ছে আর রাম রতনের মনে হচ্ছে একটা করে পাঁজর খসে যাচ্ছে। একা সন্ধ্যারানির দলই নিয়েছে একচল্লিশ হাজার টাকা। থাকা খাওয়া আলাদা। এই সুবাদে পাড়া প্রতিবেশীরা ঠিক করে নিয়েছে যে এবার রাম কৃপণ রামরতনের বাড়িতে একটা রাম খ্যাটন মারবে। সেই সুযোগে ভূতের ভয় দেখিয়ে যে যার মতো ফরমাস করছে। পাড়ার মাতব্বর ব্রাহ্মণের দল দলবেঁধে এসে তাদের কি কি লাগবে সব জানিয়ে গ্যাছে। তাতে আরো পনেরো থেকে কুড়ি হাজার টাকা লাগবে। রামরতনের বুকে হাফসোল। এতদিনের সুদের করবার, বন্ধকী কারবার সব লাল বাতি জ্বলে আর কি! একটু পরে বাজনদার রা তাদের বকেয়া পাঁচ হাজার টাকা নিয়ে গেলো। রাম রতনের আর একটা পাঁজর খসে গেল। রাতে বিকট চিৎকার করে সন্ধ্যারানির কীর্তন শুরু হলো। মাঝের সময়গুলোতে রামরতনের এক ভাইয়ের নির্দেশে বাচ্চাকাচ্চার দল তারস্বরে ছড়া আওড়ালো

" ভূত আমার পূত পেত্নী আমার ঝি
রাম লক্ষণ বুকে আছে করবি
আমার কি?"

এই শুনে নিবারণ সহ সব ভূত পেত্নীরা খ্যা খ্য করে হেসে উঠলো। ভাবলো মানুষগুলো সেই প্রাচীন যুগে পড়ে আছে।

পরদিন সকাল থেকেই বিশু ওঝা আর তার পালোয়ান শাগরেদ রতা, ঘণ্টা আর ভজা কাজ শুরু করে দিল। উঠোনের মাঝখানে একটা গোল দাগ কেটে রাম রতনকে দাঁড় করালো। কিন্তু ইতিমধ্যে একটা কাণ্ড ঘটলো। রাম রতনের ছোট ছেলে চুরি করে গরম রসগোল্লা খেতে গিয়ে কাদায় পা পিছলে পড়ে ফুটন্ত গরম রসগোল্লার কড়াইতে অনিচ্ছাসত্ত্বেও বসে পড়লো আর সঙ্গে সঙ্গে হাফ প্যান্টের ফাঁক দিয়ে ফুটন্ত গরম রস ঢুকে পাছাটা

ভীষণ ভাবে পুড়ে গেলো। সে এক হুলুস্থুল, হৈ হৈ, রই রই ব্যাপার। সবাই তাকে নিয়ে পড়লো। কিছুক্ষণ বাড়ি আর হাসপাতাল ছোটাছুটি চললো। পরে ছেলেটাকে সারাজীবন পাছাপোড়া হয়েই কাটাতে হবে।
ঘণ্টা দুয়েক পরে আবার ভূত তাড়ানোর কাজ শুরু হলো। বিশু ওঝা ছড়া কেটে বলতে লাগলো সঙ্গে রতা, ঘণ্টা আর ভজা প্রবল বিক্রমে ঢোল আর কাঁসর বাজাতে লাগলো -

লাগ লাগ লাগ লাগ, লাগ ভেলকি, লাগ ভেলকি , লাগ ভেলকি লাগ।

শংকরের দোহাই, শংকরের দোহাই,
শংকরের দোহাই।।

সঙ্গে মহিলাদের উলুধ্বনি। বিশু বললো ' এবার আপনি এক পায়ে দাঁড়ান, প্রথমে বাঁ পায়ে পাঁচ মিনিট তারপরে ডান পায়ে পাঁচ মিনিট। আর এই মন্ত্র টা বলে পেছন দিকে বেলগাছের দিকে এই ফুল গুলো ছুঁড়ে দিন।' রামরতন মন্ত্রের মাথামুন্ডু কিছু বুঝলো না। আর এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাকার অভ্যাস তার স্কুল জীবন ছাড়ার পরে চলে গ্যাছে। বার বার টাল খেয়ে পড়ে যেতে লাগলো। কোনো রকমে ব্যাপারটা সমাপ্ত হল।

এইবার বিশু ওঝা ভাঁটার মত লাল চোখ করে প্রচন্ড গর্জন করে বললো " নিবারণ তোর দিন শেষ তুই চিরকালের মতো রামরতনকে ছেড়ে চলে যাবি, আর যাওয়ার প্রমাণ স্বরূপ বেলগাছের একটা বড় ডাল টা ভেঙ্গে দিয়ে যাবি।"

নিবারণ সহ অন্যান্য ভূতেরা এই সুযোগের অপেক্ষাতেই ছিল। বিশু ওঝা বলা মাত্রই বেল গাছের যে বড় শুকনো ডালটা রামরতনের বাড়ির ওপর ঝুলে ছিল সবাই মিলে তার ওপর চেপে বসলো আর তৎক্ষণাৎ ডালটা মড়মড় করে ভেঙ্গে পড়লো, আর পড়বি তো পড় একেবারে যেখানে গনগনে আগুনের ওপর কড়াই তে গরম তেল ফুটছিল তার ওপরে। গরম তেল সহ কড়াই গেলো উল্টে, পাশে রাখা ছিল একটা মুখ খোলা কেরোসিন তেলের বোতল, উনুনের একটা জ্বলন্ত কাঠ উড়ে এসে সেই তেলে পড়লো আর মুহূর্তের মধ্যে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠে প্রথমে প্যান্ডেলের কাপড়ে আগুন লাগলো আর দেখতে দেখতে গোটা প্যান্ডেল তারপরে লাগোয়া রাম রতনের ঘরের পর্দা,বিছানা, কাঠের আলমারি, চেয়ার, টেবিল সব জ্বলতে লাগলো।

"আগুন আগুন " চিৎকার করে ছেলে বুড়ো বউ বাচ্চারা সবাই ছোটাছুটি শুরু করে দিলো। কে কোন দিকে যাবে, কোথায় পালাবে কিছুই ঠিক নেই। সকলের হতবুদ্ধি অবস্থা। এর মধ্যে রাম রতনের নিরীহ বউটার হঠাৎ মনে পড়ল কাঠের আলমারিতে রাখা গয়নার বাক্সটার কথা। ছুটলো ঘরের ভেতরে ঢুকে গয়নার বাক্স আনতে, কিন্তু ফিরতে পারলো না। আগুনের লেলিহান শিখা গ্রাস করে নিল,আর্তনাদে আকাশ বাতাস ছেয়ে গেল, ধীরে ধীরে আর্তনাদ স্তিমিত হয়ে এলো অর্থাৎ জীবন্ত দগ্ধ হলো। নিরীহ বউটা পুড়ে মরাতে নিবারণ খুব দুঃখ পেলো। এটা ও চায়নি, তার যত আক্রোশ ছিল রামরতনের ওপর।

দেখতে দেখতে রামরতনের বাড়ি সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হলো। যে যেদিকে পারে পালিয়েছে। তার দীর্ঘদিনের জমানো সুদে খাটানো বিপুল টাকা, ও সমস্ত টাকা পয়সা, গয়নাগাটি বাড়ির আলমারিতে থাকতো, ব্যাংকে বা অন্য কোথাও রাখতো না। বেআইনি পথে রোজগার বলে কথা! যাইহোক এখন খালি কিছু ছাই পড়ে আছে আর জায়গায় জায়গায় ধোঁয়া উঠছে। রাম রতন ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকলো। এক ঘণ্টার মধ্যে রাম রতন সর্বসান্ত হলো।

দু মাস পরের কথা। একটা পাগল পাগল চেহারার, উস্কোখুস্কো চুল ওয়ালা একজন রাম রতনের ভিটে তে দাড়িয়ে আছে আর বিড়বিড় করে কি সব বলছে। হটাৎ কানের পাশে কে যেনো বলে উঠল" দ্যাখ কেমন লাগে!" রাম রতন দেখলো বেলগাছের ডালটা হাওয়ায় যেন একটু দুলে উঠলো।

ড: অমল ভট্টাচার্য্য
প্রফেসর (অবসরপ্রাপ্ত)
রায়গঞ্জ ইউনিভার্সিটি
উ: দিনাজপুর, পশ্চিম বঙ্গ

অন্তিম পথে

- শঙ্কর লাল সাহা

প্রাণবায়ু ধোঁয়ার মত ভেসেভেসে হায়,
ঐ মহাশূন্যের উদ্দেশ্যে চলে যায়,
সব পিছুটান ছেড়ে হাত নেড়েনেড়ে,
অজানা ভাষায় কতকিছু বলে যায় ।

বেদনার আঁতুরঘরে মাথা গুঁজে,
কেঁদে কেঁদে মরে অসহায় বুঝে,
সে কিন্তু তার আগামী দিনের চলার পথে,
কাঁটা বিছিয়ে উধাও নিজ সুখের খোঁজে ।

আঁকড়িয়ে টেনে ধরেছিল ওরা শেষে,
দৈত্যবলে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে এসে,
অজানার ওপারে সবলে নিয়ে চলে যায়,
মুক্ত করিয়ে ব্যঙ্গের শেষ হাসি হেসে ।

স্নেহজন আপনজন শ্রেষ্ঠ প্রিয়জন,
করে নিয়ে ছিল চির একাত্মমন,
ডুঁকড়ে কান্না হাহাকারে খোঁজে ঐ তারা,
বন্ধু বর্গের স্নেহমন দিয়েছে সারা ।

অন্তরাত্মা কয় ওরে কেউ কারও নয়,
শুধু সৎকর্ম করে যা পাপ হবে ক্ষয়,
লোভ হিংসা বর্জন করে দিস ভালবাসা,
আখেরে দেখবি তোরই হবে নির্বিদ্বিধায় জয় ।

মন বলে তবে আর এত চিন্তা কেন ?
মুক্তমনে নিজেকে সংযত রেখে যেনতেন,
জীবনধারার সুকর্মসকল সফলে করে সমাধান,
অন্তিমে প্রভু পদদুটির সংস্পর্শে আসি যেন ।।

বাংলাদেশ ও ভারতে দুর্গাপূজা: ঐতিহাসিক শেকড় থেকে আধুনিকতার মহামিলন

শরতের নির্মল আকাশে পেঁজা তুলোর মতো মেঘ, ভোরের বাতাসে ভেসে আসা শিউলি ফুলের গন্ধ আর উৎসবের আগমনী বার্তা বয়ে আনা ঢাকের বোল—এই অনুভূতি বাঙালির অস্তিত্বের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। দুর্গাপূজা শুধু একটি ধর্মীয় আচার নয়, এটি বাঙালি সংস্কৃতির প্রাণের উৎসব, এক মহা-উৎসব যা বছরের পর বছর ধরে দুই বাংলার সময়কে চিহ্নিত করে আসছে। এই উৎসবের গল্প এক বিবর্তনের উপাখ্যান; পৌরাণিক কাহিনীর স্বর্গীয় আঙ্গিনা থেকে শুরু করে রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা, ঔপনিবেশিক আমলের বাবু সংস্কৃতি, স্বাধীনতার সংগ্রামের আগুন এবং অবশেষে একবিংশ শতাব্দীর গণতান্ত্রিক, সার্বজনীন ও বিশ্বজনীন সাংস্কৃতিক উৎসবে রূপান্তরের এক দীর্ঘ যাত্রা। সম্প্রতি ইউনেস্কো কর্তৃক ‘মানবতার অদৃশ্য সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য’ হিসেবে স্বীকৃতি এই যাত্রাকেই বিশ্বমঞ্চে সম্মানিত করেছে।

ইতিহাসের পাতা থেকে: পূজার আদিপর্ব

দুর্গাপূজার উৎস অনুসন্ধান করতে গেলে আমাদের দুটি ভিন্ন ধারার সন্ধান করতে হয়—একটি পৌরাণিক, যা এর আধ্যাত্মিক ভিত্তি স্থাপন করে, এবং অন্যটি ঐতিহাসিক, যা বাংলায় এর সামাজিক উৎসব হিসেবে প্রচলনের প্রেক্ষাপট তুলে ধরে।

পৌরাণিক উৎস ও শাস্ত্রীয় ভিত্তি

দুর্গাপূজার সবচেয়ে বিশদ এবং প্রামাণ্য বর্ণনা পাওয়া যায় মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত ‘দেবী-মাহাত্ম্য’ বা ‘শ্রীশ্রীচণ্ডী’-তে। এই আখ্যান অনুসারে, মহিষাসুর নামক এক অপরাজেয় অসুর দেবতাদের স্বর্গ থেকে বিতাড়িত করলে, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর সহ সকল দেবতার সম্মিলিত তেজ থেকে আবির্ভূত হন এক নারীশক্তি—দেবী দুর্গা। দেবতাদের অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে তিনি মহিষাসুরকে বধ করেন এবং ত্রিভুবনে শান্তি ফিরিয়ে আনেন। এই পৌরাণিক কাহিনীই দুর্গাপূজার মূল ভিত্তি—অশুভ শক্তির বিনাশ এবং শুভ শক্তির প্রতিষ্ঠা।
তবে শরৎকালে অনুষ্ঠিত এই পূজাকে ‘অকালবোধন’ বলা হয়, কারণ হিন্দু শাস্ত্র মতে শরৎকাল দেবতাদের নিদ্রার সময়। প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী, ত্রেতাযুগে লঙ্কা অধিপতি রাবণকে বধ করার পূর্বে ভগবান রামচন্দ্র দেবীর আশীর্বাদ

লাভের জন্য অসময়ে অর্থাৎ শরৎকালে তাঁর পূজা করেছিলেন 8। রামের এই ‘অকালবোধন’ই শারদীয়া দুর্গাপূজার পৌরাণিক উৎস হিসেবে বাঙালি সমাজে প্রতিষ্ঠিত।

বাংলায় প্রথম পূজা: এক ঐতিহাসিক বিতর্ক ও দুই বাংলার যৌথ উত্তরাধিকার

আধুনিক দুর্গাপূজার সূচনা নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ থাকলেও, দুটি প্রধান ধারা দুই বাংলার যৌথ উত্তরাধিকারকেই তুলে ধরে। এই বিতর্ক নিছক সময় বা স্থান নিয়ে নয়, বরং এর মাধ্যমে উৎসবের দ্বৈত চরিত্র— একদিকে ক্ষমতার প্রদর্শন এবং অন্যদিকে বংশীয় ঐতিহ্যের প্রতিষ্ঠা—উন্মোচিত হয়।

রাজা কংসনারায়ণ ও তাহেরপুরের উৎসব: বাংলায় বৃহৎ আকারে সামাজিক উৎসব হিসেবে দুর্গাপূজার প্রচলনের কৃতিত্ব অনেকেই বাংলাদেশের রাজশাহী জেলার তাহেরপুরের রাজা কংসনারায়ণকে দিয়ে থাকেন। ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে (আনুমানিক ১৫৮২ সাল) মুঘল সম্রাট আকবরের কাছ থেকে ‘রাজা’ উপাধি লাভের পর তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞের মতো এক বিশাল অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তৎকালীন পণ্ডিতদের পরামর্শে, বিশেষত রমেশ শাস্ত্রীর বিধানে, তিনি যজ্ঞের পরিবর্তে বিপুল সমারোহে দুর্গাপূজার আয়োজন করেন 12। কথিত আছে, সেই সময়ে তিনি প্রায় সাড়ে আট লক্ষ টাকা ব্যয় করেছিলেন, যা আজকের হিসাবে এক বিশাল অঙ্ক 14। এই আয়োজন দুর্গাপূজাকে ব্যক্তিগত পরিসর থেকে বের করে এক বিশাল সামাজিক উৎসবে পরিণত করে। কংসনারায়ণের সেই অষ্টধাতুর প্রতিমা আজ দেশভাগের পর ভারতের জলপাইগুড়িতে পূজিত হয়, যা দুই বাংলার সাংস্কৃতিক বন্ধনের এক জীবন্ত প্রতীক।

সাবর্ণ রায়চৌধুরী ও কলকাতার পরম্পরা: অন্যদিকে, কলকাতা অঞ্চলে অবিচ্ছিন্নভাবে চলে আসা সবচেয়ে প্রাচীন পারিবারিক পূজার সূচনা করে বড়িশার সাবর্ণ রায়চৌধুরী পরিবার। লক্ষ্মীকান্ত রায়চৌধুরী ১৬১০ সালে এই পূজা শুরু করেন। তাঁদের পূজার মাধ্যমেই সপরিবারে দেবী দুর্গার (লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক, গণেশসহ) একচালা কাঠামোয় আরাধনার প্রচলন ঘটে, যা পরবর্তীকালে দুর্গাপ্রতিমার এক আইকনিক রূপ হয়ে ওঠে 18।

এই দুই ঐতিহাসিক সূচনাকে প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে না দেখে বরং একে অপরের পরিপূরক হিসেবে দেখা যেতে পারে। তাহেরপুরে রাজা কংসনারায়ণের পূজা ছিল এক ধরনের রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষমতার প্রদর্শন, যা দুর্গাপূজাকে এক গণ-উৎসবে রূপান্তরিত করার পথ দেখিয়েছিল। অন্যদিকে, সাবর্ণ রায়চৌধুরীর পূজা ছিল বংশীয় ঐতিহ্য ও আভিজাত্য রক্ষার প্রতীক, যা বনেদি বাড়ির পূজার পরম্পরা তৈরি করেছিল। এই দ্বৈত উৎসই বাংলাদেশ ও ভারতে দুর্গাপূজার বিবর্তনের ভিত্তি স্থাপন করেছে।

মহালয়া: পিতৃলোক থেকে দেবীপক্ষের আগমনী সুর

দুর্গাপূজার আনুষ্ঠানিক সূচনা হয় মহালয়ার পুণ্য তিথিতে। এটি শুধু একটি ধর্মীয় দিন নয়, বরং এক গভীর সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতা যা সমগ্র উৎসবের আবেগঘন সুরটি বেঁধে দেয়।

তর্পণ, ঐতিহ্য ও পৌরাণিক তাৎপর্য

মহালয়া পিতৃপক্ষের অবসান এবং দেবীপক্ষের সূচনাকে চিহ্নিত করে 4। এই দিনে হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা প্রয়াত পূর্বপুরুষদের আত্মার শান্তির জন্য জলাশয়ে তর্পণ বা জল নিবেদন করেন 21। বিশ্বাস করা হয়, পিতৃপক্ষে পূর্বপুরুষদের আত্মা মর্ত্যে নেমে আসেন এবং তর্পণের মাধ্যমে তৃপ্ত হয়ে আশীর্বাদ প্রদান করেন 20। এই প্রথার সঙ্গে মহাভারতের কর্ণের করুণ কাহিনী জড়িত। মৃত্যুর পর স্বর্গে গেলে কর্ণকে খাদ্য হিসেবে স্বর্ণ দেওয়া হয়, কারণ তিনি জীবনে কখনও পিতৃপুরুষদের উদ্দেশে অন্নজল দান করেননি। তাঁর অনুরোধে যমরাজ তাঁকে পনেরো দিনের জন্য মর্ত্যে পাঠান, যেখানে তিনি পূর্বপুরুষদের উদ্দেশে অন্নজল দান করে পাপমুক্ত হন। এই সময়কালই পিতৃপক্ষ নামে পরিচিত 21।

বীরেন্দ্রকৃষ্ণের কণ্ঠে অমর গাথা: 'মহিষাসুরমর্দিনী'

আধুনিক যুগে মহালয়ার অভিজ্ঞতাকে নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করেছে আকাশবাণীর কিংবদন্তী অনুষ্ঠান ‘মহিষাসুরমর্দিনী’। ১৯৩১ সাল থেকে সম্প্রচারিত এই গীতি-আলেখ্যটি বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের অবিস্মরণীয় কণ্ঠ, চণ্ডীপাঠ, ধ্রুপদী সঙ্গীত এবং অর্কেস্ট্রার সমন্বয়ে বাঙালির কাছে দেবীপক্ষের সূচনার সমার্থক হয়ে উঠেছে 20। মহালয়ার ভোরে রেডিওতে ভেসে আসা “আশ্বিনের শারদপ্রাতে বেজে উঠেছে আলোকমঞ্জীর” ধ্বনি লক্ষ লক্ষ বাঙালির ঘরে একইসঙ্গে পূজার আগমনী বার্তা পৌঁছে দেয়, যা এক অভূতপূর্ব সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ঐক্য তৈরি করে 20।

প্রকৃতপক্ষে, মহালয়ার বিবর্তন আধুনিক প্রযুক্তির সঙ্গে ঐতিহ্যের মেলবন্ধনের এক উৎকৃষ্ট উদাহরণ। অতীতে যা ছিল একটি ব্যক্তিগত বা পারিবারিক স্তরের অনুষ্ঠান, আকাশবাণীর সম্প্রচার তাকে এক গণ-সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে রূপান্তরিত করেছে। প্রযুক্তি এখানে ঐতিহ্যকে প্রতিস্থাপন করেনি, বরং এর ওপর এক নতুন স্তর যুক্ত করেছে, যা উৎসবের আবেগ ও আবেদনকে বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। এটি মহালয়াকে পূর্বপুরুষদের স্মরণের দিন থেকে দেবীর আগমনের এক আনন্দময় কাউন্টডাউনে পরিণত করেছে।

আচারের পরম্পরা এবং উদযাপনের ভিন্নতা

পাঁচ দিনব্যাপী দুর্গাপূজা শাস্ত্রীয় আচার-অনুষ্ঠান এবং সামাজিক উদযাপনের এক অপূর্ব সমন্বয়। তবে স্থানভেদে, বিশেষ করে গ্রাম ও শহরের প্রেক্ষাপটে, এর উদযাপনের ধরনে ব্যাপক পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়।

পূজার মূল পর্ব: শাস্ত্রীয় রীতিনীতি

উৎসবের মূল পর্ব শুরু হয় ষষ্ঠী তিথি থেকে এবং শেষ হয় দশমীতে প্রতিমা বিসর্জনের মাধ্যমে।

- **ষষ্ঠী:** এই দিনে কল্পারম্ভের মাধ্যমে পূজার সূচনা হয় এবং সন্ধ্যায় দেবীর বোধন, আমন্ত্রণ ও অধিবাস অনুষ্ঠিত হয় 6।
- **সপ্তমী:** এই দিনের প্রধান আকর্ষণ নবপত্রিকা স্থাপন, যা সাধারণভাবে 'কলাবউ' নামে পরিচিত। নয়টি উদ্ভিদকে একত্র করে স্নান করিয়ে শাড়ি পরিয়ে গণেশের পাশে স্থাপন করা হয়, যা দুর্গাপূজার সঙ্গে কৃষিসংস্কৃতির গভীর যোগসূত্রকে নির্দেশ করে 25।
- **অষ্টমী:** পূজার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিনগুলোর একটি। সকালে ভক্তরা সমবেতভাবে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন। অনেক জায়গায় এই দিনে কুমারী মেয়েদের দেবী রূপে পূজা করা হয়, যা 'কুমারী পূজা' নামে পরিচিত 25।
- **সন্ধিপূজা:** অষ্টমী ও নবমী তিথির সংযোগকালে এই পূজা অনুষ্ঠিত হয়। ৪৮ মিনিট স্থায়ী এই পূজায় ১০৮টি প্রদীপ জ্বালানো হয়। বিশ্বাস করা হয়, এই সময়েই দেবী দুর্গা চামুণ্ডা রূপে চণ্ড ও মুণ্ড অসুরদ্বয়কে বধ করেছিলেন, যা এই মুহূর্তটিকে অত্যন্ত নাটকীয় ও আধ্যাত্মিক তাৎপর্যপূর্ণ করে তোলে 25।
- **দশমী:** উৎসবের শেষ দিন। বিবাহিত নারীরা সিঁদুর খেলায় মেতে ওঠেন, যা দেবীকে বিদায় জানানোর এক আবেগঘন প্রথা। এরপর প্রতিমা বিসর্জনের মধ্য দিয়ে উৎসবের সমাপ্তি ঘটে, এই আশায় যে মা আবার আগামী বছর ফিরে আসবেন ।

গ্রাম বনাম শহর: দুই বাংলার দুই রূপ
দুর্গাপূজার উদযাপন গ্রাম ও শহরে দুটি ভিন্ন রূপ নিয়েছে, যা বাংলার আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনের এক সুস্পষ্ট প্রতিচ্ছবি।

গ্রামের পূজা: গ্রামের পূজা এখনো অনেকাংশে ঐতিহ্য ও আন্তরিকতাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়। এখানকার পূজা মূলত কোনো বনেদি পরিবার বা ছোট সম্প্রদায়ের উদ্যোগে আয়োজিত হয়। আড়ম্বরের চেয়ে ভক্তি ও সামাজিক অংশগ্রহণের ওপর বেশি জোর দেওয়া হয়। গ্রামের প্রতিটি মানুষ কোনো না কোনোভাবে পূজার সঙ্গে যুক্ত থাকে—কেউ প্রতিমা সাজায়, কেউ সবজি কাটে, আবার কেউ বা ঢাক বাজায় 27। প্রতিমাতেও সনাতনী একচালা রীতির প্রাধান্য দেখা যায়।

শহরের পূজা: অন্যদিকে, কলকাতা বা ঢাকার মতো বড় শহরের পূজা এক বিশাল কার্নিভালের রূপ নিয়েছে। এখানে থিম-ভিত্তিক পূজা, চোখ-ধাঁধানো আলোকসজ্জা, কর্পোরেট স্পনসরশিপ এবং বিপুল বাজেটই প্রধান আকর্ষণ 28। মণ্ডপগুলো কখনো ভ্যাটিকান সিটি, কখনো বা কোনো ঐতিহাসিক মন্দিরের আদলে তৈরি হয়, যা নিছক পূজা মণ্ডপ না থেকে একেকটি শিল্পকর্ম বা আর্ট ইনস্টলেশনে পরিণত হয়েছে।

তবে এই চাকচিক্যের আড়ালে একটি উদ্বেগজনক বাস্তবতাও রয়েছে। অশোক রুদ্রের মতো পর্যবেক্ষকরা দেখিয়েছেন যে, শহরের পূজার আকর্ষণে গ্রামের উৎসবগুলো ক্রমশ জৌলুস হারাচ্ছে। পূজার সময় বহু গ্রাম প্রায় জনশূন্য হয়ে পড়ে, কারণ গ্রামবাসীরা কাছের শহরগুলোতে ঠাকুর দেখতে চলে যায় 28। এর ফলে, দুর্গাপূজার মতো একটি লোকউৎসব তার শিকড় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। শহরের পূজা যেখানে এক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে, সেখানে গ্রামের ঐতিহ্যবাহী পূজাগুলো অস্তিত্বের সংকটে ভুগছে।

বৈশিষ্ট্য	গ্রামের পূজা	শহরের পূজা
আয়োজক	বনেদি পরিবার বা ছোট সম্প্রদায়	ক্লাব, বারোয়ারি কমিটি, কর্পোরেট সংস্থা
প্রতিমার ধরণ	ঐতিহ্যবাহী, সনাতনী (সাধারণত একচালা)	থিম-ভিত্তিক, শৈল্পিক, পরীক্ষামূলক

উদ্দেশ্য	ভক্তি, ঐতিহ্য রক্ষা, সামাজিক মিলন	শিল্প প্রদর্শন, প্রতিযোগিতা, বিনোদন, ব্র্যান্ডিং
পরিবেশ	আন্তরিক, শান্ত, ভক্তিমূলক	জাঁকজমকপূর্ণ, কোলাহলময়, উৎসবমুখর
অর্থায়ন	পারিবারিক অনুদান, স্থানীয় চাঁদা	কর্পোরেট স্পনসরশিপ, বিজ্ঞাপন, সরকারি অনুদান
অংশগ্রহণ	সকলের সক্রিয় অংশগ্রহণ	মূলত দর্শক ও পর্যটকদের ভিড়

সময়ের স্রোতে উৎসবের বিবর্তন
দুর্গাপূজা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে পরিবর্তন করেছে এবং বাংলার সামাজিক-রাজনৈতিক ইতিহাসের এক জীবন্ত দলিল হয়ে উঠেছে।

জমিদারবাড়ি থেকে বারোয়ারি: এক সামাজিক উত্তরণ
ঔপনিবেশিক আমলে, বিশেষ করে কলকাতায়, দুর্গাপূজা নব্য জমিদার ও ‘বাবু’ শ্রেণির সম্পদ ও প্রতিপত্তি প্রদর্শনের এক মাধ্যমে পরিণত হয়েছিল 29। শোভাবাজার রাজবাড়ির রাজা নবকৃষ্ণ দেবের মতো ব্যক্তিত্বরা রবার্ট ক্লাইভের মতো ব্রিটিশ কর্মকর্তাদের আমন্ত্রণ জানিয়ে বিশাল খরচে পূজার আয়োজন করতেন 17। এই অভিজাততন্ত্রের বিরুদ্ধে এক সামাজিক প্রতিবাদ হিসেবে জন্ম নেয় ‘বারোয়ারি’ বা সার্বজনীন পূজা। হুগলির গুপ্তিপাড়ায় ১৭৯০ সাল নাগাদ বারোজন বন্ধু (‘বারো’ + ‘ইয়ার’) মিলে চাঁদা তুলে প্রথম বারোয়ারি পূজার সূচনা করেন, যা ছিল সাধারণ মানুষের পূজা 31। কলকাতায় ১৯১০ সালে বাগবাজারের ‘সনাতন ধর্মোৎসাহিনী সভা’ আনুষ্ঠানিকভাবে প্রথম বারোয়ারি পূজা শুরু করে, যা পূজাকে জমিদার বাড়ির আঙ্গিনা থেকে বের করে সাধারণ মানুষের উৎসবে পরিণত করে 17।

স্বাধীনতার স্পন্দনে দুর্গাপূজা
ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে দুর্গাপূজা এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। পূজা মণ্ডপগুলো, বিশেষ করে সিমলা ব্যায়াম সমিতির মতো সংগঠনের পূজা, বিপ্লবীদের গোপন বৈঠক এবং জাতীয়তাবাদী চেতনা প্রচারের কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল 32। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর মতো নেতারা সরাসরি বেশ কয়েকটি পূজার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং পূজার মঞ্চকে স্বদেশী মেলার আয়োজন এবং ব্রিটিশবিরোধী প্রচারের জন্য ব্যবহার করতেন 1।

প্রতিমা থেকে প্যান্ডেল: শিল্পের নবজাগরণ

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে দুর্গাপূজার শিল্পকলাতেও এক বিপ্লব ঘটেছে। রাজা কংসনারায়ণের সময়কার ঐতিহ্যবাহী 'বাংলা চালি' বা একচালা প্রতিমার আঙ্গিক থেকে সরে এসে আধুনিক পূজা আজ শিল্পকলার এক বিশাল প্রদর্শনীতে পরিণত হয়েছে 13। বর্তমানে প্রতিমা শিল্পী ও থিম-শিল্পীরা মাটি ছাড়াও নাট-বল্টু, লোহার তার, ফেলে দেওয়া বর্জ্য পদার্থসহ বিভিন্ন অপ্রচলিত উপাদান ব্যবহার করে প্রতিমা ও মণ্ডপ নির্মাণ করছেন, যা পরিবেশ সচেতনতার বার্তাও বহন করে 35। ঐতিহ্যগতভাবে পুরুষদের পেশা হলেও, বর্তমানে নারী এমনকি স্কুলপড়ুয়া শিক্ষার্থীরাও প্রতিমা নির্মাণে এগিয়ে আসছে, যা এক ইতিবাচক সামাজিক পরিবর্তনকে নির্দেশ করে 37। এই বিবর্তন প্রমাণ করে যে, দুর্গাপূজার মণ্ডপ নিছক একটি উপাসনালয় নয়, বরং এটি সমসাময়িক সমাজের চিন্তা, উদ্বেগ ও শিল্পচেতনার এক জীবন্ত ক্যানভাস।

একবিংশ শতকের দুর্গোৎসব: বিশ্বায়নের আঙ্গিকে

বর্তমান সময়ে দুর্গাপূজা তার ধর্মীয় পরিচয় ছাপিয়ে এক বিশ্বজনীন সাংস্কৃতিক উৎসবে পরিণত হয়েছে, যা অর্থনীতি, প্রযুক্তি এবং সামাজিক সম্প্রীতির এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে।

ধর্ম ছাপিয়ে সংস্কৃতি: এক সার্বজনীন মিলনক্ষেত্র

আজ বাংলাদেশ ও ভারত উভয় দেশেই দুর্গাপূজা ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের উৎসবে পরিণত হয়েছে। এটি এখন আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতি ও সামাজিক ঐক্যের এক শক্তিশালী প্রতীক 39। মুসলমান, খ্রিস্টান এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের মানুষও মণ্ডপে মণ্ডপে ঘুরে বেড়ান, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশ নেন এবং উৎসবের আনন্দে সামিল হন 41। এই পাঁচ দিন সামাজিক ভেদাভেদ ভুলে মানুষে মানুষে মিলনের এক অপূর্ব সুযোগ তৈরি হয়।

উৎসবের অর্থনীতি ও প্রযুক্তির স্পর্শ

দুর্গাপূজা এখন এক বিশাল অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্র। পশ্চিমবঙ্গে এই উৎসবের অর্থনীতি প্রায় ৪৫,০০০ থেকে ৮৪,০০০ কোটি টাকার, যা রাজ্যের জিডিপির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ 43। প্রতিমা শিল্পী, প্যান্ডেল নির্মাতা, আলোকশিল্পী, ঢাকী থেকে শুরু করে পোশাক বিক্রেতা ও খাদ্য ব্যবসায়ী

—লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবিকা এই উৎসবকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে 45। একইসঙ্গে, প্রযুক্তিও এই উৎসবের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে গেছে। একদিকে যেমন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) ও ভিএফএক্স (VFX) ব্যবহার করে মহালয়ার নতুন ডিজিটাল সংস্করণ তৈরি হচ্ছে, তেমনই ইন্টারনেট ও সামাজিক মাধ্যমের প্রভাব নিয়ে তৈরি হচ্ছে পূজার থিম 48। অন্যদিকে, নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সিসিটিভি, আইপি ক্যামেরা এবং সোশ্যাল মিডিয়া মনিটরিং-এর মতো প্রযুক্তি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে 50।

ইউনেস্কোর স্বীকৃতি: বিশ্বমঞ্চে কলকাতার দুর্গাপূজা

২০২১ সালে ইউনেস্কো 'কলকাতার দুর্গাপূজা'-কে 'মানবতার অদৃশ্য সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য' হিসেবে স্বীকৃতি দেয় 2। এই আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি নিছক একটি সম্মাননা নয়, এটি দুর্গাপূজার সেই অনন্য বৈশিষ্ট্যকে সম্মান জানানো, যেখানে ধর্মীয় আচার, শিল্পকলা, কারুশিল্প এবং সামাজিক অংশগ্রহণ মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে 3। এই স্বীকৃতি প্রমাণ করে যে, দুর্গাপূজা এখন আর শুধু বাঙালির উৎসব নয়, এটি বিশ্ব সংস্কৃতির এক মূল্যবান সম্পদ। তবে এই স্বীকৃতির একটি অন্তর্নিহিত বিরোধাভাস রয়েছে। উৎসবের 'অদৃশ্য' ঐতিহ্য (যেমন সামাজিক অংশগ্রহণ, শিল্পীর দক্ষতা) যখন বিশ্বজনীন স্বীকৃতি পাচ্ছে, তখন তার বাহ্যিক রূপটি এক বিশাল 'দৃশ্যমান' বাণিজ্যিক অর্থনীতির ওপর দাঁড়িয়ে আছে। ভবিষ্যতের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো, এই বাণিজ্যিক চাকচিক্যের চাপে উৎসবের সেই আন্তরিক ও মানবিক আত্মাটিকে বাঁচিয়ে রাখা।

উপসংহার: ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা ও আগামীর ভাবনা

শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে দুর্গাপূজা রাজনৈতিক উত্থান-পতন, দেশভাগ এবং সামাজিক পরিবর্তনের সাক্ষী থেকেছে, কিন্তু বারবার নিজেকে নতুন রূপে আবিষ্কার করেছে। এর অভিযোজন ক্ষমতা এবং নমনীয়তাই এর টিকে থাকার মূল শক্তি।

আজকের দিনে এই উৎসবের সামনে নতুন কিছু চ্যালেঞ্জ রয়েছে—ক্রমবর্ধমান বাণিজ্যিকীকরণ, পরিবেশের ওপর এর প্রভাব, শহর ও গ্রামের মধ্যে সাংস্কৃতিক বৈষম্য এবং নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয়তা 52। তবে এই সমস্ত কিছুর ঊর্ধ্বে দুর্গাপূজার আবেদন চিরন্তন। কারণ এর মূলে রয়েছে 'আগমনী'র সুর—মেয়ের ঘরে ফেরার

আনন্দ। শিল্প, অর্থনীতি বা রাজনীতির ঊর্ধ্বে, এই উৎসবের প্রাণশক্তি নিহিত আছে সেই গভীর ব্যক্তিগত ও সম্মিলিত আবেগে, যা প্রতি বছর মা দুর্গাকে ঘরের মেয়ে হিসেবে বরণ করে নেয়। এই অনুভূতিই প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে দুর্গাপূজাকে প্রাসঙ্গিক ও জীবন্ত রাখবে, আর বাঙালিরা প্রতি বছর অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করবে উৎসবের এই পাঁচটি দিনের জন্য 12।

-শুভ্র পাল

হ্যালিফ্যাক্স, কানাডা

তোমায় খুঁজে ফিরি

তুমি জগদ্দল ! নাকি প্রাণময় ! হে ঈশ্বর !
সাকার স্বরূপে নিরাকার অরূপে তোমায় খুঁজে ফিরি ,
তুমি পুরুষোত্তম ! প্রকৃতি !নাকি চির অবিনশ্বর !
দ্বৈত অদ্বৈত - কোন সত্বায় তোমায় প্রণাম করি !

যখন আশিস নিয়ে গুরুজনের চিত্তশুদ্ধ হয় ,
অচেনা , তবু সমবেদনায় চোখ ভরে জল আসে ,
মানুষের শুভ ভালোবাসায় জীবন ধন্য মনে হয় -
সেখানেই কি তোমার প্রকাশ অন্তরালে হাসে !

কান পেতে শুনি , নিবিড় অরণ্যও বুঝি অবাক বাঙময় !
সাগরের ঢেউ তীর ছুঁয়ে যায় - মন হয় উত্তাল ,
নিঃসীম শৈল নির্জনে মন সন্ন্যাস নিতে চায় ,
তখনি অনুভবী মন , একান্তে শোনে তোমার কলরোল ।

পূজার বেদীতে শাঁখের আওয়াজ শত ঘন্টাধ্বনি ,
ব্যস্ত কত ভক্তের দল , তোমার দরশনে ,
সন্ধ্যায় পূত মন্ত্রপাঠ ! আজানের সুর শুনি
দিকে দিকে ওঠে চরণের ধ্বনি , সুগভীর মননে ।

-ধারা ভৌমিক ভাদুড়ী
পুরুলিয়া ,পশ্চিমবঙ্গ

"স্ট্যাটাস"

রাত দশটা।চতুর্দ্দশীর পরিস্কার আকাশ।ছাতে চলছে স্বামী স্ত্রীর তর্জা।
স্ত্রী---আমি কয়েক দিনের জন্য ট্যুরে গেছি,আর সেই সুযোগে তুমি ঐ বুড়ো বুড়িকে নতুন ঘরে ঠাঁই দিয়েছ?

স্বামী--- ওরা তোমার পুজনীয় মানুষ,শ্বশুর-শাশুড়ি, সম্মান দিয়ে কথা বল।

--- আমাকে জ্ঞান দিও না।সমাজ সেবা করে তোমার অসুস্থ মা বাবার সেবা করার সময় আমার নেই। আমার কথা তোমাকে বহুবার বলেছি, 'ওদের বৃদ্ধাশ্রমে পাঠাও।' তুমি বসে আছ মধ্যবিত্তের মানসিকতা নিয়ে।এখন বৃদ্ধাশ্রমে থাকায় সামাজিক মর্যাদা ক্ষুন্ন হয়না,বরং বৃদ্ধি পায়।

--- আমি তোমাকে বারে বারেই বলেছি,আমি মা বাবাকে বৃদ্ধাশ্রমে পাঠাব না।নিজে যা উপার্জন করি তা দিয়েই সংসার চালিয়ে নেব।
--- তাহলে মনে রেখ,কলকাতার নামী অঞ্চলে দামী ফ্ল্যাট কেনা, ছেলে মেয়েকে উচ্চমানের স্কুল কলেজে পড়ানো কিম্বা আমাদের সমাজে প্রতিষ্ঠা পাওয়া কোনটাই তোমার সম্ভব হবে না।যদি আমার কথা না শোন তবে আমাকেই অন্য পথ বেছে নিতে হবে।এতগুলো বছর সংসার করার পর দেখছি বাবার কথাই সত্যি হতে চলেছে।বাবা বলেছিলেন,"মনোজিত ছাত্র হিসাবে কৃতি বলেই ভাল চাকুরি পেয়েছে কিন্তু ও আমাদের স্ট্যাটাসের নয়,ওকে বিয়ে করলে ভবিষ্যতে তোকে ভুগতে হবে।"

--- আমি মা বাবাকে বৃদ্ধাশ্রমে না পাঠালে তুমি কী করবে?

--- আমি আসানসোলে বাবা মায়ের কাছে ফিরে যাব।ছেলে মেয়েকে ওখানেই পড়াব।দাদা তো বলেই ছিল ওখানে গিয়ে একটা শো রোমের দায়িত্ব নিতে।বৌদি নাকি হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে।

--- যতটা মনে পড়ে তুমি দুঃখ করে বলতে বাড়ির অমতে বিয়ে করায় তোমার বাবার মতো দাদা ও তোমার সঙ্গে যোগাযোগ বন্ধ করে দিয়েছে। তোমার মা আগে মাঝে মাঝে ফোন করত ; সেটাও বন্ধ হয়ে যায় তোমার বৌদি সংসারের হাল ধরার পরে।যাক ইতিমধ্যে আবার সবার সঙ্গে সম্পর্ক ঠিক করতে পেরেছ,তাই তো ?

---- সম্পর্ক ভাঙ্গা গড়ার কী আছে? মা বাবার সঙ্গে ছেলে মেয়েদের মাঝে মধ্যে কখনো সখনো মতের অমিল হতেই পারে।আমি কাছে গেলেই তারা আমাকে সাদরে গ্রহন করবে।আমার মা বাবা তো তোমার মা বাবার মত কপর্দকশূণ্য নয় যে ওখানে গেলে আমার কোনও অভাব হবে!

--- শোন পৃথা,বাবা বা মায়ের মূল্যায়ন টাকা-পয়সা দিয়ে হয় না।আমার মা- বাবা তোমাকে যে আন্তরিকতা দিয়েছেন, তুমি কি বলতে পার তোমার মা বাবা আমার সাথেও অনুরূপ হৃদ্যতা দেখাবেন? তুমি তোমাদের স্ট্যাটাসের কথা বলবে; আমি কিন্তু তোমাকে জোর করে তুলে নিয়ে আসি নি।কলকাতায় পড়তে এসে পেপারে আমার আর্টিকেল পড়ে ,যোগাযোগ করে ভালবেসে বাড়ির অমতে আমার সঙ্গে সংসার বেঁধেছিলে।
পৃথা বলল ," দেখ অবিনাশ,আমাদের এই ধরনের আলোচনা তো প্রাত্যহিক ব্যাপার; ছেলে মেয়েরা ও তা বুঝে গেছে,আমি তোমাকে একমাস সময় দিচ্ছি,সমু ও রোমীর অ্যানুয়াল পরীক্ষার পরে তুমি যদি তোমার মা-বাবাকে বৃদ্ধাশ্রমে না পাঠাও তাহলে আমি তোমাকে ছেড়ে আসানসোলে চলে যাব।"

---তোমার যেমন ইচ্ছা করতে পার।আজ নিজের সন্তানদের নিয়ে আমাকে ছাড়তে চাইছ; বড় হয়ে ওরা যখন তোমাকে ছাড়বে তখন আঘাত টা অনুভব করতে পারবে।

---- তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে ;তাই বললেআমার ছেলে মেয়ে ভবিষ্যতে আমাকে ছেড়ে যাবে।ওরা কখনও আমাকে ছেড়ে যাবে না। আমাদের সোসাইটিতে এমনটা হয় না।এসব মধ্যবিত্ত পরিবারে ঘটে। আমার দাদা, মা-বাবাকে ছেড়ে গেছে কি?বরং দাদা ই বিদেশে লেখা পড়া করে দেশে ফিরে বাবার ব্যাবসা বহুগুণে বাড়িয়েছে।

এদের কথাবার্তা চলতে চলতে রাত বাড়ছিল;চাঁদের আলো হচ্ছিল উজ্জ্বল। ঠিক বারোটা দশ মিনিটে পৃথার মোবাইলে একটা ফোন এল।পৃথা মৃদুস্বরে বলল হ্যালো; অপর দিক থেকে প্রায় কাঁদ কাঁদ স্বরে ভেসে এল," পৃথা আমি বাবু বলছি। " পৃথা বিচলিত হয়ে বলল," কী হয়েছে ড্যাডি, এত রাতে তুমি কাঁদ কাঁদ স্বরে কথা বলছ কেন?

---শোন মা আমি তোর মাকে নিয়ে আগামীকাল কলকাতা আসছি।

----কেন বাবা,মায়ের কি শরীর খারাপ? চিকিৎসা করাতে নিয়ে আসছ?

---- শোন মা,বয়স হলেও আমাদের শরীর স্বাস্থ্য ঠিকই আছে।তোর সঙ্গে তো অনেক বছর যোগাযোগ নাই,ইতিমধ্যে অনেক কিছু ঘটে গেছে।তোর দাদা ব্যাঙ্ক থেকে অনেক টাকা লোন তুলে ব্যবসা অনেক বড় করেছিল। আমাকে অবসরে পাঠিয়ে লোকজন নিয়ে নিজেই সব কিছু করছিল।ওর শ্বশুর বাড়ি ইন্দোরে ও ব্যবসা ছড়িয়েছিল।পুরোনো কর্মচারী বলতে একমাত্র মাধব অবসর নিয়েও আমাদের দেখাশোনার জন্য আসানসোলেই থেকে গেল।বাজার মন্দা হওয়ায় ব্যবসা মার খেতে লাগল। লোনের টাকা শোধ করতে ব্যাঙ্ক থেকে চাপ বাড়াতে লাগল।মামলা মোকদ্দমায় জের বার করে ব্যাঙ্ক আমাদের বসত বাড়ি নিলামে তোলার ব্যবস্থা করছে।বাড়িটা রজত বন্ধক রেখেছিল ব্যাঙ্কের কাছে।দুদিন পরেই বাড়ি নিলাম হবে।এ দৃশ্য দেখার আগেই আমি আসানসোল ছাড়তে চাইছি।তোর দাদা ঠাকুরপুকুরে একটা বৃদ্ধাবাসে কথা বলে রেখেছে।রজতের স্ত্রী ছেলে -মেয়েদের নিয়ে ইন্দোরে চলে গেছে।রজত ও আসানসোল ছেড়ে ইন্দোর চলে যাবে। তাই আমাদের জন্য বৃদ্ধাবাসের ব্যবস্থা করেছে।মাধব একথা শোনে জেদ ধরেছে
আমাদের কিছুতেই বৃদ্ধাবাসে যেতে দেবে না।জোকায় ওর বাড়িতে নিয়ে যাবে।সকালের ট্রেনেই আমরা হাওড়া আসছি।
লাউড স্পিকারে শ্বশুরের সব কথা শোনে মনোজিত বলল,"চল দুজনেই কাল হাওড়া স্টেশনে যাই।"
--- তোমার যাওয়া ঠিক হবে না।বাবা তোমাকে কোনোদিন মেনে নেয় নি; তুমি গেলে ভাববে বিপদের দিনে মজা দেখতে এসেছে।
---- শোন পৃথা,তোমরা স্ট্যাটাস সম্পন্ন সমাজের বড়াই কর বলেই মনে এত জটিলতা।আমি তোমার মা -বাবাকে অসম্মান করতে যাব না; আমরা থাকতে তিনি অধস্তন এক কর্মচারীর বাড়িতে আশ্রয় নিবেন এটা আমাদের মধ্যবিত্ত সমাজের রীতি নয়।আমি ওদের বুঝিয়ে সসম্মানে আমাদের বাড়ি নিয়ে আসব।দোতলার নতুন দুটি ঘরের একটিতে যেমন আমার মা বাবা আছেন তেমনি অপরটিতে থাকবে তোমার মা-বাবা।

-ড.চন্দ্রশেখর চক্রবর্তী
কলকাতা,ভারত

শারদীয়া আগমনী

- স্বাতী আচার্য
গড়িয়া, কলকাতা।

মাটির বুক থেকে ভোরের ঘ্রাণ ওঠে
ফুলেরা কথা বলে শিউলির,
কমলা রং লেগে আকাশে ছয়লাপ
আকিন্চন রাত পৃথিবীর।

শিশিরের ছোঁয়া লাগে ঘাসের আগায়
মায়ের আগমনী আবেশ জাগায়
হাঁসের দল চলে শিশিরের পথ বেয়ে
ডানায় রাত্রির চিহ্ন,
সেসব ধুয়ে নিলে জলের আয়নায়
ভোরের মুখ উৎকীর্ণ।

বর্ষায় হঠাৎ শরতের আকাশ
মাঠভর্তি ছাঁকা রোদ্দুর,
পেঁজা তুলোর মেঘেরা ভাবে
বৃষ্টি ঝরাবে কিনা
আগমনীর বার্তা কদ্দুর।

মেঘেরা মন খারাপ সরিয়ে রেখে
পালতোলা নৌকা হয়ে হাসে
শিশুদের নতুন জামার আনন্দে
শারদীয়ার সুর ভাসে।

এসেছে শরৎ জাগো রে মেয়ে
সাজো দুর্গার সাজে,
দানব দলনী রূপটি এবার
ধর ধরিত্রীর মাঝে।
ও মেয়ে তুই অস্ত্র রাখিস
বুকের খাঁজে,
জানিস না তুই অসুর আসবে
কিসের সাজে,
সবে তো আজ আগমনীর বাজনা বাজে।।

মা আসছেন।

পুজো আসছে, দুর্গা পুজো, এত দিন জলে ভরে ছিল মাঠ প্রান্তর, একটু একটু করে জল কমতেই কাশ বনে কাশেরা সাদা হয়ে উঠছে, চাঁদ উঠছে, কখনো নির্মল আকাশ তখনই মেঘের আঁচলে ঢাকা পড়ছে ভুখন্ড। শিউলির দেখা নেই।
আমি তো লিখিনা, লেখে তিন জন, কাগজ কালি মন,
পুজো আসছে কিন্তু মন ভালো নেই, প্রকৃতি প্রতিশোধ নিচ্ছে, প্রকৃতি মানুষ মারছে , মানুষ প্রকৃতিকে মেরেছে, মেঘ ভাঙ্গা বৃষ্টি, হড়পা বন্যায় ভেসে যাচ্ছে হিমালয় গিরির বিস্তির্ণ দেবভূমি। শত শত মানুষ, জীব জন্তু হড়পা বানের বিপুল কাদা পাথরের খরস্রোতে পর্বত ভাঙ্গা পলির তলায় মৃত। পৃথিবী জুড়ে অতিবৃষ্টি, বন্যা কবলিত অসংখ্য মানুষের হাহাকার,
নদীর দুপাড় ভেঙে বসত ডুবে গেছে নদীগর্ভে।
মানুষ প্রকৃতিকে মারছে, প্রকৃতি মানুষ মারছে, মানুষ মারছে মানুষ। উদয়াস্ত যুদ্ধ, যুদ্ধ যুদ্ধ- রবে ধ্বংসের লীলা খেত্র ধরনী।
মাগো এসো, মন ভালো নেই।
মাগো মন ভালো নেই।।

--গুড়াকেশ রায়চৌধুরী

কথা

অনুপা ভৌমিক
মেরিল্যান্ড, USA

আজকাল কথারা আমার কথা শুনছেনা
মাঝে মাঝে নিজেদের ইচ্ছেমত কাজ করছে।
কথা বলতে বলতে হঠাৎ দেখি তারা উধাও
থেমে গিয়ে তাদের খুঁজতে থাকি।

খুব ছোটবেলায় কথা বলার ভয়ে
পালিয়ে বসে থাকতাম চিলেকোঠায়
কিম্বা গল্পের বই নিয়ে সোফার পিছনে।
বাড়িতে সদস্য ছিল যথেষ্ট
তাই কথা বলার দায়টা ছিল কম।
আমার কথা না বলার শূন্য স্থানটা
অতি সহজেই পূর্ণ হয়ে যেত।

যৌবনে পৌঁছে আবিষ্কার করলাম কথার জাদু,
কথার মোহিনী শক্তি আমার মত সামান্যাকেও
অসামান্যা করতে পারে!
কথার পিঠে কথা সাজানোর খেলায়
মেতে উঠেছিলাম নিজেরই অজান্তে।

ষাঠের কোঠায় পৌঁছে বুঝলাম
কথাদের আর ভালবাসতে পারছিনা
বেশী কথা শোনা বা বলার
অধৈর্য আর আড়াল করা যাচ্ছেনা।

সত্তরোর্ধে এখন কথা বলা বা শোনার লোক গোনাগুনতি।
বোকা পর্দার জ্ঞানগর্ভ বা অবান্তর কথা
কানের পর্দায় ধাক্কা দিয়ে পিছলে বেরিয়ে যায়।
কথাকে আমি এখন ভয় করি
দুহাত দিয়ে তাদের আঁকড়ে রাখতে চাইলেও
তারা মুঠোর মধ্যে দিয়ে
টুপটাপ গলে যায়।
আর কয়েক দিনের মধ্যেই আমি
কথার মৃত্যুর সঙ্গী হব।

তোমাকে খুঁজতে গিয়ে

-দেবাশিস হালদার

তোমাকে দেখার উন্মাদনায় ছিল ঝলমলে রোদ,
তোমাকে শোনার আকুতিতে ছিল বিলম্বিত বাতাস।
শুধু তুমি ছিলে না।

তোমাকে খুঁজতে এপাড়া ওপাড়া,
দেশ দেশান্তর,
স্বর্গ পাতাল তোলপাড়।
শুধু তুমি দেখা দিলে না।

তোমাকে পাওয়ার আকুতিতে
ঘর ছাড়লাম, পথ ধরলাম।
রাস্তার নরম পিচের গরমে,
নিঃশ্বাসে, ঘামে অনুভব করলাম,
তুমি নীরব চোখে তাকিয়ে থাকলে।

আজ দেখো অশ্বত্থ গাছের মত আমি,
নিথর এক সংগ্রামী,
ঝিমিয়ে অবাক চোখে,
দেখি তুমি ছিলে, আছো,
এখনো, আজও,
গাছেদের ফুল ও ফলে,
পাখিদের ঘরে ফেরার দলে,
গন্ধে, আলোয়, উচ্ছাসে,
পুলকে, আনন্দে, উল্লাসে।

এতগুলো বছর লেগে গেলো তোমাকে বুঝতে,
আমার মত করে তোমাকে খুঁজতে।

পলাশের নেশা দিয়ে

আমার কবিতা ভাসে
ফাগুনের উতল হওয়ায়
পলাশের রঙে মিশে
মধুপের ডানায় ডানায়।

পলাশ কোথায় আর ?
আছে কবিতায়, কাব্যে -
যাও বা দু-চার আছে
প্রকৃতিতে,তাও কমবে।

তবু,পলাশের নেশা জাগে
প্রতিবার বসন্ত এলে ;
এবারে তো চৈত্রেই
গ্রীষ্মের দাবদাহ মেলে ।

এভাবে চললে তো আর
বাঁচার রসদ মেলা দায় !
রূপ -ঋতু - বিলাসিতা সব
নেবে তখন বিদায় ।

পাগল, প্রেমিক, কবি ,
তখন কোথায় সব যাবে?
রং হারা প্রকৃতিতে
কেমনে কিভাবেবাঁচা যাবে?

তবে এসো সব কবি
তোমাদের সৃজনিকা
নিয়ে
রূপে রঙে ভরে তুলি
পৃথিবীকে সরসতা দিয়ে

এখনো বসন্তে জাগে
অপরূপ রূপের মাধুরী -
শ্রাবণের ধারাপাতে
হয় মন মত্ত দাদুরী ।

এখনো এসব তুমি
এইখানে এ দেশেতে
পাবে
বৃথা ঘুরে ফিরো নাকো
মিথ্যে খোঁজার গৌরবে ।

তবে , তুমি কিছু দাও
প্রকৃতির সব রং নিয়ে -
তুমি কিছু দিয়ে যাও
পলাশের আগুনে রাঙিয়ে।

-পূর্ণিমা বসু
বর্ধমান, পশ্চিম বঙ্গ

Anxiety

This poem is dedicated to those who struggle with anxiety.

When I sleep

Someday, my heart will beat a normal rhythm,
Someday, I will breathe a little longer,
Someday, my teeth will not clench so much,
Someday, my stance will be stronger.

Someday, my thoughts will not race against time,
Someday, I will smile without burden to please,
Someday, I will walk with more confidence,
Someday, I will just exist at ease.

Today is not that day, though.
Today, I miss a breath every minute, my smile falters and my heart races.
I am nervous about existing, just like when I had braces.
I cry without tears and stand with a flawed posture, making a meal is hard.
I don't sleep through the night, and I look like a mess, and I wear a night guard.
I am yelling for help, there are voices in my head, but I can't hear my own voice.
I feel that the earth will crumble to pieces and fall apart, with all this noise.
I feel that I will lose something I love with every passing moment, my fear so deep.
Someday, I will rest and be happy, and at peace, when the world stops and I finally sleep.

Being a Physiotherapist, I work with clients who have high anxiety, so I have learned some strategies that have helped them. I am not a counselor, hence most of the time I would refer to a psychologist; however, sometimes these strategies have helped many people.
Some YouTube videos – BODY SCAN, AUTOGENIC RELAXATION, MINDFULNESS

APPS – HEADSPACE And CALM

5 4 3 2 1 strategy – 5 things that you can see, 4 things that you can touch, 3 things that you can hear, 2 things that you can feel, 1 thing that you can smell.

Please share with someone that you know may be suffering from anxiety.

Written by Sushmita Chatterjee

She is Durga, She is Shakti

-Poulomi Bandyopadhyay

When the dhaak begins to play,
When alpona lights the way,
We call to Ma with folded hands -
But know, she walks across these lands.
She is Durga, she is Shakti.

Not just in idols draped in red,
Not only where the mantras are said.
Her courage lives in every heart,
In daughters, sisters, who play their part.
She is Durga, she is Shakti.

She smiles in mothers who hold us tight,
She roars in women who claim their right.
In silent strength, in battles won,
In every woman - Ma is one.
She is Durga, she is Shakti.

So why should worship fade away,
Once drums are still, once ends the day?
Let Agomoni always stay,
In every season, work, and way.
She is Durga, she is Shakti.

Honor her voice, her dreams, her way,
In every moment, every day.
The world is whole when she stands tall,
For she is the power within us all.
She is Durga, she is Shakti.

Where Devotion Meets Community: BAAC's First Durga Pujo

Durga Pujo — not just a festival,
but a utsob that beats in every Bengali heart.
An emotion, a homecoming,
a rhythm of dhak that echoes across continents.
Wherever they are in the world,
every Bengali waits, yearns, and lives
for the sacred days—
when the goddess descends,
and the soul remembers its roots.

Bengali Association of Atlantic Canada, a newly formed society celebrated its first ever Durga Pujo, "Dashabhuja Durgoutsav"

And this year was special —
for the first time, I was not just a spectator,
but part of the heartbeat behind the scenes.
We formed teams with excitement in our eyes, held countless late-night calls, dreaming, debating, laughing. We planned every detail — from the first welcome to the final farewell.

Menus were chalked out with care, responsibilities shared like sacred mantras.

We hunted down every last item, from pujo essentials to décor touches — each one carrying the weight of tradition and love.
There were so much more — moments of chaos, bursts of creativity, and a quiet joy in watching when it all come together.

My biggest takeaway? When people come together with pure hearts and shared purpose, everything somehow falls into place.

The chaos, the long nights, the endless calls, the sweat and effort — all of it melts into sweetness when you see joy lighting up every face.

And in the end, it's not the scale of the event that matters, but the big smiles, the warm laughter, and the quiet blessing from the elders — a simple "God bless you" that feels like a reward beyond words.
That, truly, is all we ever hope for.

Subho Bijoya shobai ke
Shobai Khub bhalo theko

-Shrabanti Das

Many Ramayanas

Besides Valmiki's Ramayana in Sanskrit, there are many versions of the epic in other languages. Some are based on Valmiki's version, while others are based on regional folklore. With elements of the local rituals, practices and beliefs, these retellings give the legendary epic a wider audience.

Krittivasi Ramayana -

The Krittivasi Ramayana was written by Krittibas Ojha in Bengali. The festivals and rituals in the story are described as being celebrated in the Bengali tradition. By writing his work in a language that could be read and/or spoken by the people of the Bengal region, he hoped to dissolve their differences and unite them.

Ramcharitmanas -

It literally means 'the lake of the deeds of Rama', and was written in Awadhi by Tulsidas. Based on Valmiki's Ramayana, this epic poem is also divided into seven kands or volumes. The sixth kand, however, is called Lanka kand, unlike Valmiki's Yuddha kand. It was composed in the 15th century and is celebrated as one of the greatest works of Hindi literature.

Ramavataram -

The Ramavataram or Kamba Ramayana, by the Tamil poet, Kamban, was written during the reign of the Cholas in the9th century. This version, interestingly, does not include the episodes from Valmiki's Uttara Kanda.

A popular legend speaks of how the goddess of the Tiruvottiyur temple(in present day Chennai) held a lamp for Kamban while he wrote the last 10,000 verses of this text.

Paumachariya -
This version of epic, is a Jain retelling of the Ramayana. Based on the principles of Jainism, this version describes Rama as an elevated soul who does not commit any violent deed. And so it is Lakshmana who kills Ravana. Ravana is not portrayed as an evil asura but as a good man who is blinded by his desire for Sita.

Ranganatha Ramayanam -
The Ranganatha Ramayanam was written in Telugu by Gona Budda Reddy, a 12th century poet. It comprises 17, 290 couplets unlike Valmiki's Ramayana with 24,000 couplets. The popular story of the lines on the squirrels back, as a mark of Rama stroking it, the first appeared in the Ranganatha Ramayanam.

Jagmohana Ramayana -
The Jagmohana or Dandi Ramayana was written by Balarama Dasa, in the Odiya language, in the 15th century. He composed it in the honour of Lord Jagannath, an incarnation of Vishnu. The text is named after the porch "Jagmohan", of the famous Jagannath Temple at Puri, where he is believed to have written it. The story is in the form of a narration by Parvati to Shiva.

-Atanu Das Gupta

Name: Aharshi Mukherjee, Son of Moumita Chattopadhyay
Age: 6 years

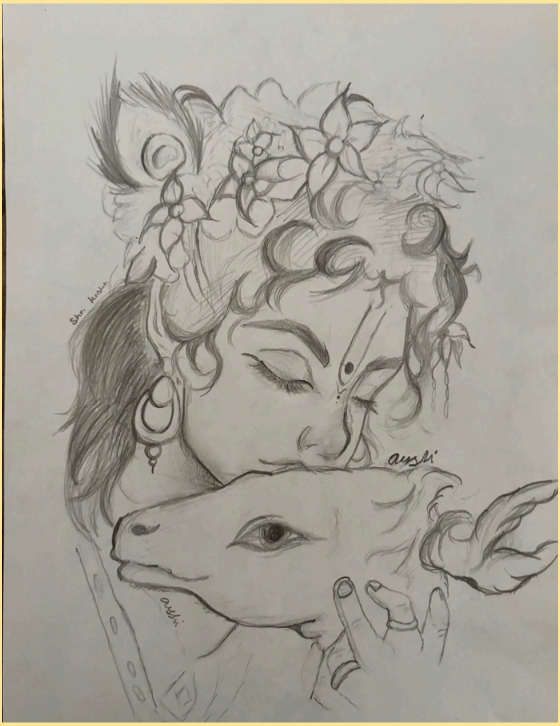

Arshi Ghosh
Halifax, Canada

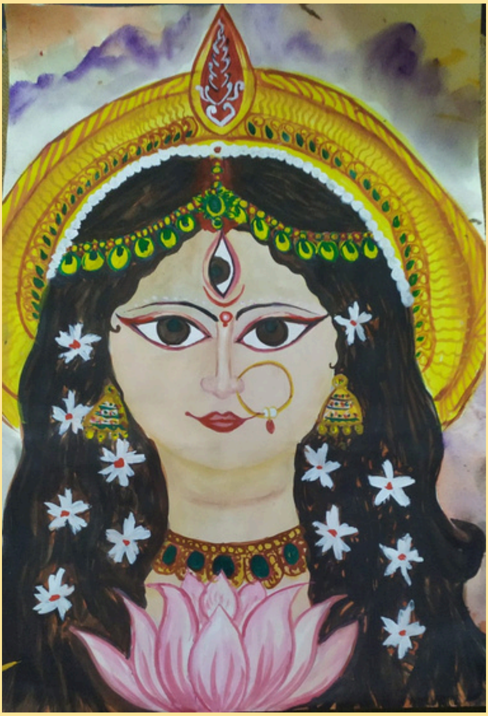

Sonaxshi Roy,
Magura,
Bangladesh

-Trisha Chatterjee

Artist : Anandee Seal
Age:18
Place : Karnal, India

It's a Art wort of Radha-Krishna done on Metal sheet by embossed with wooden pencil. Then painted with metal color.

Sujata Saha,
Startford, PEI

Gond art is a traditional tribal folk art from the Gond communities of central India, characterized by its intricate dots and lines, vibrant use of natural pigments, and depictions of nature, mythology, and daily life.

Name: Sanghamitra Bhanja
Place: Jaipur, Rajasthan

Kerala murals are an ancient Indian fresco-painting tradition originating in Kerala, characterized by bold colors and depictions of Hindu mythology, found on temple and palace walls.

Name: Sanghamitra Bhanja
Place: Jaipur, Rajasthan

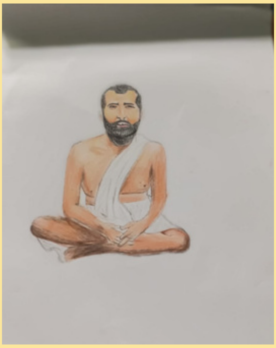

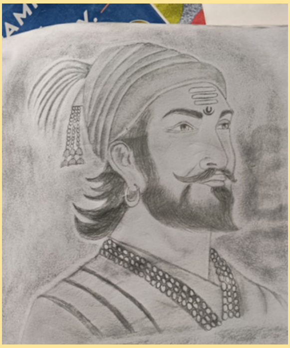

-Nishan Pal
(Kolkata)

Dr. Purnima Bosu.
Asansol
Bardhaman

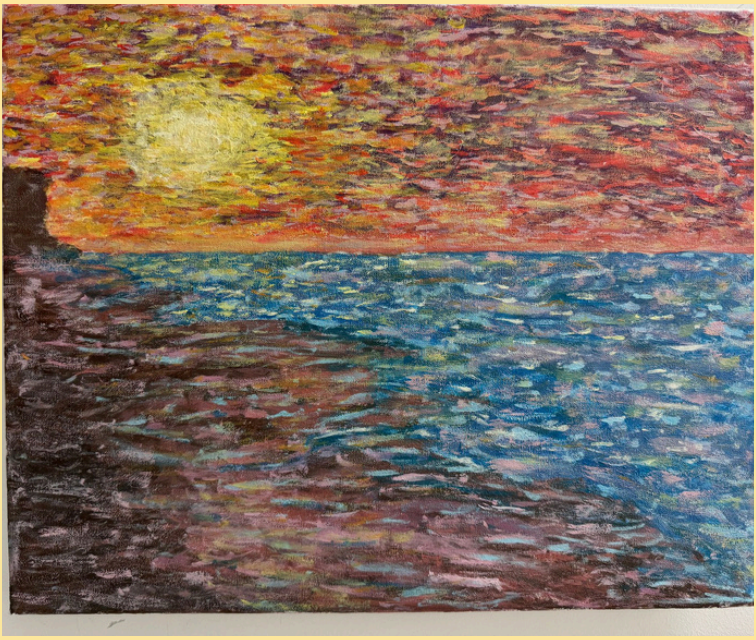

-Nikol Mashtalyar Ray

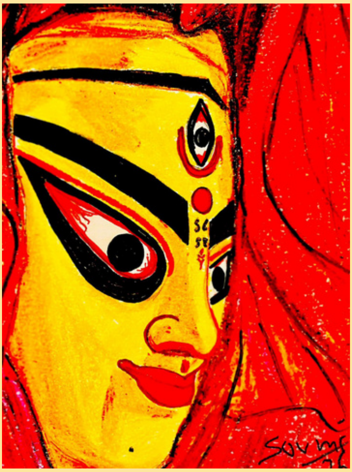

Soumi Sinha, Colombus, USA

-Priyom Ray

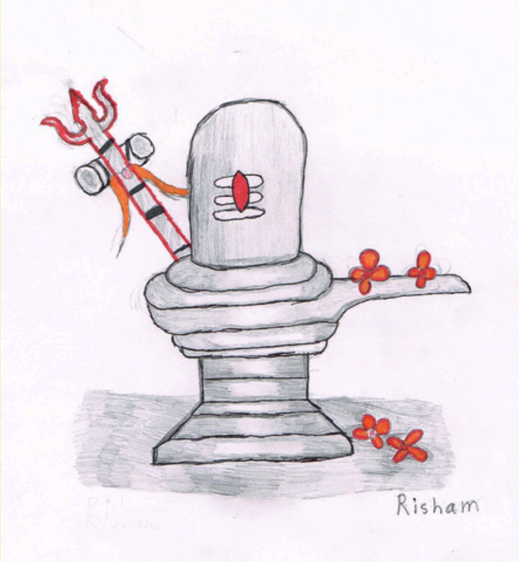

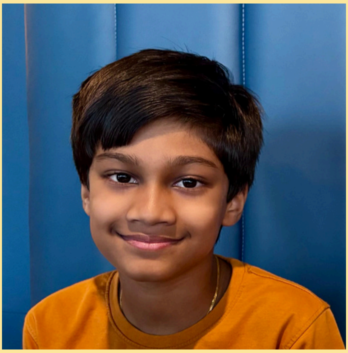

-Risham Ray

-Photography by Bidisha Som

Chief Guest -
Dr. Barani Prasath Sambandan and his wife

Decorations Team

1. Bithika Ray
2. Shrabanti Das
3. Shuvro Pal
4. Methila Biswas Raya
5. Sumita Mitra
6. Attrayee Bank
7. Rebecca
8. Ishita Chowdhary

Priest Team

- Somaditya Das
- Sushmita Chatterjee
- Soumita Boşu Roy Choudhuri
- Ishita Chowdhary
- Debapriya Chatterjee
- Arjak Bhattacharya
- Tathagata Ray
- Sandhita Saha

Cooking Team

- Avijit
- Sujit
- Sharmi
- Ishita
- Sushmita
- Bithika
- Soumita
- Baitali
- Jhulan
- Sonam
- Rimi
- Deepa
- Poulomi
- Sumita

<u>Cultural Organizations Team</u>

- **Sourav**
- **Diptangshu Datta**
- **Devi Chakrabarti**
- **Kaustav**
- **Debabrata**
- **Yogesh**
- **Anuradha**
- **Aishwaryapriya Auddy**

Procurement Team:

- **Giban Ray**
- **Binoy Halder**
- **Aroop Chatterjee**
- **Amit Chowdhary**

Registration Team:

- **Binoy Halder**
- **Shrabanti Das**
- **Sushmita Chatterjee**
- **Aroop Chatterjee**
- **Bithika Ray**
- **Kallol Bosu Roy Choudhuri**
- **Soumita Bosu Roy Choudhuri**

Pratima Transportation Team

- **Anindyo Banerjee**
- **Arjak Bhattacharjee**
- **Sourav Dutta**
- **Binoy Halder**
- **Giban Ray**
- **Kaustav Banerjee**
- **Kallol Bosu Roy Choudhuri**
- **Milan Pal**
- **Tathagata Ray**
- **Surajit Sarkar**
- **Tomonood Ghosh**

Varate Chai- Natok Performers

BAAC-bone of Our Organization !
Nari Sakti

MEN

THANK
YOU